০ (১০ সেকেণ্ডের শট)

কালো রঙের প্রেক্ষাপটে ধীরে ধীরে সিনেমার থিম পোস্টার ফুটে ওঠে- সৃষ্টিসন্ধানের নিবেদন – চশমা|

তারপর আবার ধীরে ধীরে কালো প্রেক্ষাপটে মিশে যায়।

১ (৩০ সেকেণ্ডের শট)
কালো রঙের প্রেক্ষাপট ভেদ করে ধীরে ধীরে শহর কলকাতার ভোরের আকাশরেখা পরিস্ফুট হয়। মনে হয় যেন রাতের অন্ধকার কেটে ভোরের প্রথম আলো ফুটে উঠল।
(ভোরের রাগ শোনা যায়, আলাপ)
ভোরের কোলকাতা – কুয়াশা ঢাকা সকাল। নীলচে ধুসর, প্রায় একরঙা ছবি, শুধু পূব আকাশে একটু লালের ছোঁয়া। ভোরের মোহময় আকাশ, তার প্রক্ষাপটে দুএকটি পাখির বিক্ষিপ্ত উড়ান, শহর কলকাতার বিস্তৃত আকাশরেখা পার করে ক্যামেরা ধীরে ধীরে নীচের অপরিচ্ছন্ন, অপরিকল্পিত কংক্রিটের জঙ্গলে ফোকাস করে। ধুসর প্রেক্ষাপটে দেখা যায় একটি বাড়ির জানলা থেকে একফালি হলুদ আলো বাইরে এসে পড়ছে, পাস থেকে সদ্য ধরানো উনুনের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরে উটছে। ইঁট বার করা মলিন চেহারার বাড়ি। [ক্যামেরা লংশটে একবার শুধু বাড়িটাকে ছুঁয়ে যায়]
প্রধান বিষয়গুলির কুশীলব দের নাম [বাঁদিকের ওপরের কোনায় এক এর পর এক ভেসে উঠে মিলিয়ে যেতে থাকে]

পরিচালনা –
চিত্রনাট্য, সংগীত পরিকল্পনা - ভাস্কর
চিত্রগ্রহণ –
বিমলেন্দু বিশ্বাসের চশমা বিভ্রাট কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে।

ছবি ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হযে যায়, পরের দৃশ্য ভেসে ওঠে

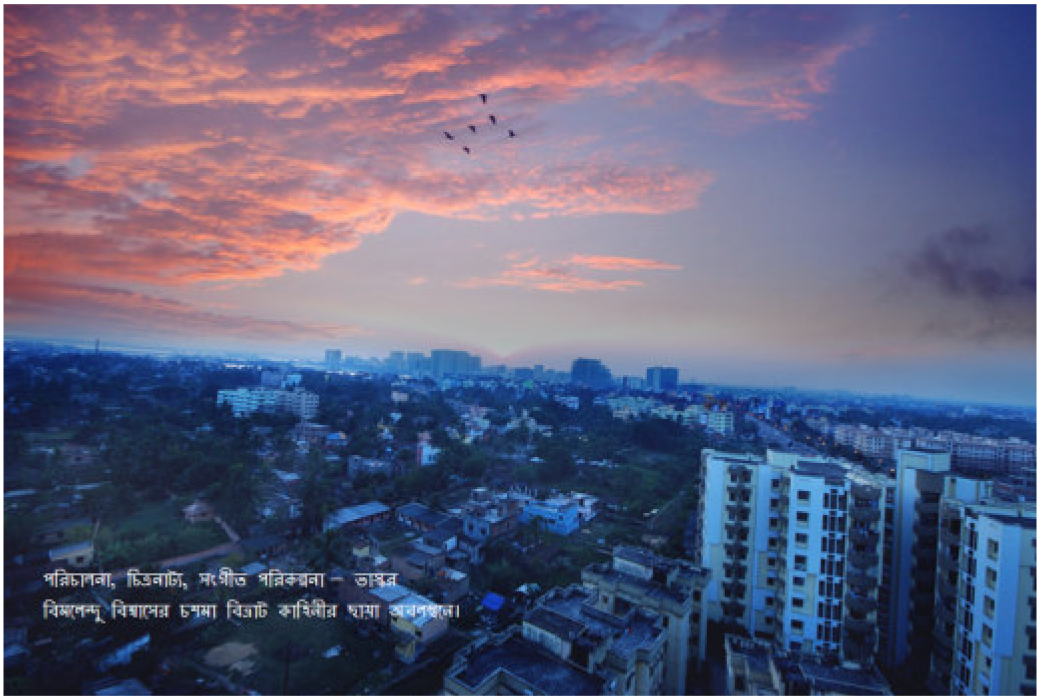

২ (১০ সেকেণ্ডের শট)
আগের দৃশ্যের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে কলকাতার এক ব্যস্ত রাজপথ।
(ভোরের রাগ পেছনে অস্পষ্ট শোনা যায়, সামনে ব্যস্ত রাস্তার গাড়ির শব্দ)
ক্যামেরা ওপর থেকে একটা বড়ো রাস্তাকে ফোকাস করে, তার পর ধীরে ধীরে জুম করে মিড শটে রাস্তার মাঝবরাবর স্থির হয়। বড়ো রাজপথ, সকালবেলাতেই কিছুটা ব্যাস্ততা। কুয়াশার ভেতর দিয়ে গাড়ির হেডলাইট, আর লাল আলো শুধু চোখে পড়ে। ঝাপসা সাদাকালো প্রেক্ষাপটে শুধু গাড়ির আলোটুকুতেই রঙ। কুয়াশার চাদর ভেদ করে রাস্তার দুধারে উঁচু উঁচু কিছু আকাশ ছোঁয়া বাড়ি চোখে পড়ে। ক্যামেরা রাস্তার মাঝখান থেকে একটা গাড়িকে ফলো করে ডানদিকে ঘোরে।

৩ (২০ সেকেণ্ডের শট)
আগের দৃশ্যের সঙ্গতি রেখে একটা অপেক্ষাকৃত ছোট রাস্তা চোখে পড়ে।
(গাড়ির শব্দ অস্পষ্ট হয়ে পায়রার বকবকম শোনা যায়, আলাপের সুর অস্পষ্ট শোনা যায়)
ক্যামেরা রাস্তার একটা ধার চেপে সোজা ফোকাস করে, চোখে পড়ে একটা কুয়াশা ঢাকা সরু রাস্তা, ট্রামলাইন টা শুধু চকচক করছে। ধুসর নোংরা রাস্তা, ঘুমিয়ে আছে। প্রায় একরঙা ছবি। ট্রাম লাইনের তারে পায়রার দল। রাস্তার ধারে একটা জায়গায় অনেক পায়রা ভিড় করে দানা খাচ্ছে। কালো কালো পায়রাদের ভিড়ে শুধু একটা সাদা পায়রাকে দেখা যায়। সাদা পায়রাটাকে ক্যামেরা বিশেষ ভাবে ফলো করে। একটা রিক্সা কুয়াশা ভেদ করে বের হয়ে পাশ দিয়ে চলে যায় । রিক্সার ছবি সিলুটে। রিক্সা একটা আরো সরু গলির ভেতর ঢুকে যায়। ক্যামেরা পেছন থেকে রিক্সাকে অনুসরণ করে গলিতে ঢোকে।

৪ (২০ সেকেণ্ডের শট)
আগের দৃশ্যের সঙ্গতি রেখে একটা আরও ছোট গলি রাস্তা চোখে পড়ে।
(গাড়ির শব্দ আর শোনা যায় না, আলাপের সুর অস্পষ্ট শোনা যায়)
ক্যামেরা সরু গলি রাস্তার একটা ধারে একতলার ওপর থেকে সামনের একটা বাড়িকে ফোকাস করে। গলির মোড়ে দুটো কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। ক্যামেরা একটা ভাঙা ভাঙা দেওয়াল ওয়ালা বাড়ির দরজায় ফোকাস করে। দরজার পাশে সিমেন্টের রক, বসার যায়গা। পাশের জানলার কাঁচ দিয়ে ভেতরের হলুদ আলো দেখা যায়। দরজার মাথায় কার্ণিশে দুটো পায়রা পালক ফুলিয়ে বসে। দরজার সামনে সদ্য ধরানো উনুন, একজন প্রৌঢ়া দরজা খুলে এসে হাওয়া দেয়, তারপর ভেতরে নিয়ে যায়। প্রায় সাদাকালো কুয়াশাচ্ছন্ন ছবি। শুধু দরজা খোলার সময় ভেতর থেকে উষ্ণতার স্পর্শ মাখা একফালি হলুদ আলো বাইরে এসে পড়ে। ক্যামেরা উনুন নিয়ে প্রৌঢ়ার চলে যাওয়া অনুসরণ করে বাড়িতে ঢোকে।

৫ (৩০ সেকেণ্ডের শট)
নিম্ন মধ্যবিত্ত একটি বাড়ির ভেতর চোখে পড়ে। অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার টুকরো ছবি।
(সংসারের প্রাত্যহিক শব্দতরঙ্গ, জলের এবং মুখ ধোয়ার শব্দ শোনা যায়)
ক্যামেরা দরজার কাছ থেকে বাড়ির বাগান, দালান আর ঘরকে ধরে, মিডশটে। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ব্যস্ত সকাল। দালানওয়ালা একটা খুব পুরোন বাড়ি। মাঝখানে অনেকখানি দালান, তার একদিকে দুটো ঘর, ডান দিকে রান্নাঘর, তার আগে ছাদের সিঁড়ি। দালানের সামনে একটুখানি উঠোন, কিছু ফুলগাছ, অনেক আগাছা গজিয়ে আছে চারিদিকে। দেওয়ালের মাঝেমাঝে প্লাস্টার উঠে গেছে, ইঁট বার

হয়ে রয়েছে জায়গায় জায়গায়, দালানের থামে। দালান লাগোয়া উঠোনের গায়ে একটা কল। উঠোনের মাঝে আগাছা ঘেরা একটা লম্বাটে স্কালপচার, নারীমূর্তি, মাথায় কিছু লতাপাতার আদল, তার একটা হাত নাচের ভঙ্গিতে তোলা। ক্যামেরা চারদিকে ঘুরে মূর্তির ওপর ফোকাস করে। তার হাতে একফোঁটা শিশির হীরের মত জ্বলজ্বল করছে। ধুসর প্রক্ষাপটে একফোঁটা শিশিরটাই শুধু উজ্বল হয়ে ফুটে ওঠে। সেখান থেকে সরে গিয়ে ক্যামেরা ফোকাস করে দালান সংলগ্ন রান্নাঘরে। সেখানে দেখা যায় মার সাংসারিক ব্যস্ততা, মেয়ে সদ্য ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুচ্ছে। ক্যামেরা ঘরের দরজা দিয়ে ভেতরে ফোকাস করে, বিছানায় বাবাই ঘুমিয়ে আছে দেখা যায়। প্রত্যেককে প্রথমবার দেখানোর সময় তার নামটাও দেখানো হয়। [ছবিতে রঙের ব্যবহার খুব কম, নীলচে সবুজ ধুসর রংয়ের ছবি, শুধু রান্নাঘরের থেকে একফালি হলুদ আলো দালানে এসে পড়ে। ঘরের বাইরে সকালের স্বাভাবিক প্রতিফলিত আলো।
ক্যামেরা ধীরে ধীরে জুমআউট করে বাড়ির দরজার বাইরে চলে আসে।
ছবি ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হযে যায়, পরের দৃশ্য ভেসে ওঠে

৬ (১০ সেকেণ্ডের শট)
আগের দৃশ্যের ভেতর দিয়ে উঁচু থেকে দেখা শহর কলকাতার ছবি ধীরে ধীরে ভেসে ওঠে।
(আলাপের সুর আবার অস্পষ্ট শোনা যায়)
ক্যামেরা দরজা থেকে জুমঃআউট করতে করতে আবার ফিরে যায় কলকাতার এরিয়াল ভিউতে (১ম শটের মত)। এরিয়াল ভিউ থেকে এবার ক্যামেরা জুম ইন করতে থাকে বহুতল আবাসনের একটি জানলায়। তার জানলা দিয়ে বের হয়ে আসছে উজ্বল সাদা আলো।

৭ (২০ সেকেণ্ডের শট)
উচ্চ মধ্যবিত্ত একটি বাড়ির ভেতর চোখে পড়ে। অত্যন্ত সচ্ছল জীবনযাত্রার টুকরো ছবি।
(রামদেবের যোগাসন শিক্ষার আওয়াজ শোনা যায় টিভি থেকে, সঙ্গে পিয়ানোয় পাশ্চাত্য সঙ্গীতের হালকা সুর)
ক্যামেরা ড্রইংরুমের দেওয়াল জোড়া জানলার সামনে থেকে পুরো ফ্লোরটাকে ধরে। বাড়ির ভেতর, উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের সকাল। সচ্ছলতার চিহ্ন সব দিকে। ক্যামেরা সেই চিহ্ন গুলো বিশেষভাবে ধরে। ঘরের ভেতরে অনেক উজ্বল রঙ, ছবিতে রঙের পরিমান অনেকখানি বেড়ে যায়। মাকে দেখা যায় টিভির সামনে সোফায় বসে, মন দিয়ে রামদেবের অনুষ্ঠান দেখতে। গায়ে উজ্বল স্লিপিং গাউন। মোটাসোটা গোলগাল চেহারা। দু এক বার প্রাণায়াম করতেও দেখা যায়। কাজের লোককে দেখা যায় রান্নার জোগাড় করতে।

(পিয়ানোর সুর মিলিয়ে যায়)
মা – চা আর অমলেট টা আগে করো। পাঁউরুটিটা একটু কড়া করে টোস্ট করো।

বাবা মর্নিওয়াক করে ফেরে। টিশার্ট, হাফপ্যান্ট, পায়ে নাইকির জুতো, মাথার চুল একদম সাদা, সরু মুখ, ছিপছিপে চেহারা। মুখের অভিব্যক্তিতে চাতুর্যের আভাষ পাওয়া যায়।

[সবাইকে প্রথমবার দেখানোর সময় তার নামটাও দেখানো হয়]

৮ (১৫ সেকেণ্ডের শট)
প্রাতভ্রমণ সেরে ফিরে আসা ভদ্রলোকটিকে ঘরে ঢুকতে দেখা যায়।
(কিবোর্ডের হালকা সুর, একটা রহস্যময়তা তৈরি করেতে সাহায্য করে। পেছনে রামদেবের যোগাসন শিক্ষার আওয়াজ শোনা যায় টিভি থেকে অস্পষ্ট ভাবে। শোনা যায় সেখানে ত্যাগের কথা বলা হচ্ছে।)
ক্যামেরা বাবাকে ফলো করে। বাবা ঘরে ঢুকে পকেট থেকে পার্স বার করে টেবিলে রাখে। হাত থেকে ঘড়ি খুলে রাখে। ক্যামেরা অফিসের কাজের টেবিলে একটা টেণ্ডারের ওপর বিশেষ করে ফোকাস করে। পাশে মুখখোলা একটা সাদা খাম।
(সুর মিলিয়ে যায়)

৯ (৩০ সেকেণ্ডের শট)
(টিভির আওয়াজ আগের মতই শোনা যেতে থাকে)
ক্যামেরা আবার ড্রইংরুমে ফিরে আসে। গাড়ি ধুতে লোক আসে, বাজারের ব্যাগ দিয়ে যায়।
মা – হ্যাঁ এসেছো। দাঁড়াও চাবিটা দিচ্ছি।... (মা উঠে গিয়ে ঘরের ভেতর থেকে গাড়ির চাবি নিয়ে আসে, লোকটিকে দেয়)
মা – এনেছো বাজার। কি মাছ পেলে আজকে। দেখি, নিয়ে এসো তো এদিকে।
লোক – আজ ট্যাংরা আর পাবদা এনেছি মাসিমা। ট্যাংরা গুলো একদম জ্যান্ত ছিল।
মা – ভালো। কাল তাহলে মাংস এনো।
মা সোফাতে বসেই বাজার নেড়ে চেড়ে দেখে, তারপর টিভির রিমোট অফ করে উঠে পড়ে, একবার একটা ভেজানো দরজা অল্প খোলে। দরজার ফাঁক দিয়ে ববিকে দেখা যায় বিছানায় ঘুমিয়ে থাকতে।
(পাশ্চাত্য সঙ্গিতের হালকা সুরটা আবার শোনা যায়, তারপর মিলিয়ে যায়)

১০ (১:৩০ মিনিটের শট)
বাড়ির বারান্দা, তিনটা বেতের চেয়ার, মাঝে একটা টি টেবিল। বাবাকে কাগজ নিয়ে বসে থাকতে দেখা যায়। বাইরেটা অস্পষ্ট, কুয়াশা ঢাকা।
(পাশ্চাত্য সঙ্গিতের হালকা সুরটা বাজতে থাকে, কথা শুরু হলে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়।)
মা ট্রেতে করে চা এর সরঞ্জাম নিয়ে এসে বসে। বাবা কাগজে ডুবে আছে, ইকনমিক টাইমস। বাইরে কুয়াশা ঢাকা সকাল। সামনে একটা বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট কম্পেকসের আভাষ পাওয়া যায়, কিছু গাছপালা। মা চা ঢেলে দেয়, নিজেও নেয়।
বাবা – কি, ছেলে এখনো ঘুমোচ্ছে।
মা - আহা, কাল অনেক রাত পর্যন্ত অফিসের কাজ করেছে, একটু ঘুমোক।
বাবা – হুঁ (কাগজ থেকে মুখ না সরিয়েই কথা বলে) ঘুমাক। (স্বরে একটু ব্যঙ্গ মিশে থাকে)
মা – (কিছুক্ষন চুপচাপ) কাল বিকেলে দিদি এসেছিল...
বাবা – কি বলে।
মা - বাবাই এর এখনো কোন চাকরি হলনা... তাই চিন্তা করছিল।
বাবা – তা আমাদের কাছে কি দাবি। আমাকে চাকরি করে দিতে হবে? (হাতের কাগজ গুটিয়ে রাখে, চায়ের কাপ তুলে নেয়।) এখন চাকরি পাওয়া অতই সোজা! ছবি এঁকে কি চাকরি পাবে শুনি? (চায়ে চুমুক দেয়) তাও তো আমি মি: সিংঘানীয়াকে বলে রেখেছিলাম। ওকে বলেছিলাম আমার রেফারেন্স দিয়ে গিয়ে দেখা করতে...বাবু দেখাই করলেন না! আশ্চর্য... মাঝখান থেকে আমার ফেস লস। ... এতটুক সিরিয়াসনেস না থাকলে এই বাজারে কিছুই হবেনা, ওই টিউশানি করেই খেতে হবে।

ক্যামেরা জুম আউট করে, ধীরে ধীরে পুরো আবাসন চত্তরটাকে ধরে। বাচ্চাকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া, কাগজওয়ালার সাইকেল, এরকম সকালের প্রাত্যহিক কাজের কিছু টুকরো ছবি ধরা পড়ে।
(পাশ্চাত্য সঙ্গিতের হালকা সুরটা আবার শোনা যায়।)
ছবি ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হযে যায়, পরের দৃশ্য ভেসে ওঠে

১১ (৩০ সেকেণ্ডের শট)
আগের ছবির ভেতর দিয়ে বাবাইদের বাড়ির গলি রাস্তা ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে।
(একটি মেয়ের গলায় গানের সুর শোনা যায়, ক্রমশ স্পষ্ট হয়। “তোমার সুর শুনায়ে, যে ঘুম ভাঙাও” সঙ্গে শুধু তানপুরার সংগত)
ক্যামেরা গলিরাস্তায় ফিরে আসে, বাবাইদের বাড়ির একটু দুরে মিড শটে বাড়ির আশপাশটা ধরে। গানের রেওয়াজের সুর শোনা যায়। সামনের একটা বাড়ির দোতোলার ছাদ সংলগ্ন ঘরের ভেতর থেকে গানের সুর ভেসে আসে। জানলা দিয়ে শুধু তানপুরার অংশবিশেষ আর একটা হাত চোখে পড়ে। এখন সকালের হালকা রোদ, কুয়াশার স্তর পাতলা।

১২ (২:৩০ মিনিটের শট)
বাবাইদের বাড়ির ভেতর
(গানের সুর এখানেও শোনা যায়, একটু অস্পষ্ট)

ক্যামেরা দরজার কাছ থেকে বাবাইদের বাড়ির ভেতরটা দেখায়। মা রান্নায় ব্যস্ত, বোন শাক কাটছে রান্নাঘরের বাইরে। গৃহস্থালির শব্দের পেছনে হালকা গানের রেশ শোনা যায়। ক্যামেরা ঘরের ভিতরে আসে, বাবাই ঘুমিয়ে আছে, অগোছালো বিছানা, গায়ের থেকে চাদর অনেকখানি সরে গেছে। বাবাই চিত হয়ে শুয়ে আছে, ক্যামেরা ঘুমন্ত মুখে ফোকাস করে। খোঁচা খোঁচা না কামানো দাড়ি ওয়ালা মুখ, কিছুটা ক্লিষ্ট। চোখের পাতা মৃদু কাঁপে, ঘুম পাতলা হয়ে এসেছে বোঝা যায়। গানের সুর এখানে অনেক স্পষ্ট। ক্যামেরা চোখের ওপর জুম করতে করতে অন্ধকার হয়ে যায়। (অন্তরে তার গভীর ক্ষুধা, গোপনে চায় আলোক সুধা)

স্বপ্ন দৃশ্য – রুক্ষ পাথুরে জমি, আদিগন্ত বিস্তৃত, দূরে সম্পূর্ণ নেড়া একটা গাছ, আকাশে লালচে কালো মেঘ, হুহু হাওয়ায় উড়ে আসছে। ক্যামেরা সেই নেড়া গাছের দিকে এগোতে থাকে, যেন কেউ দৌড়ে যাচ্ছে। ক্রমশ গানের সুর স্পষ্ট হতে থাকে, আকাশ থেকে মেঘ সরে যেতে থাকে। একসময় গাছের নীচে এসে ক্যামেরা স্থির হয়, সামনে এবার আদিগন্ত সবুজ মাঠ। ক্যামেরা এবার ওপর থেকে ফোকাস করে। নেড়া গাছ ক্রমশ ফুলে ভোরে ওঠে, নীল আকাশে সূর্য ওঠে, গানের সুর শোনা যায় স্পষ্ট। গাছের নীচে একটা ছায়া মূর্তি কোমরে হাত দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে, সূর্যের দিকে চেয়ে। (তারি লাগি আকাশ আকাশ রাঙা...শোনাও তারে আগমনী)। হঠাত ছবিটা কেঁপে গিয়ে মুছে যায়, বিছানায় ফিরে আসে।

মা - এই... বেলা যে দুপুর হতে চলল, পড়ে পড়ে ঘুমোলেই চলবে... (বাবাইকে ঠেলে তোলে ঘুম থেকে)
বাবাই ওঠে মুখ ধোয়।
মা – বাজার করতে হবে কিন্তু আজকে, বাড়িতে আর আনাজ পাতি কিছু নেই।
বাবাই – হবেখোন...
মা – হবেখোন না, আগে এনে দে বাবা। বাজার না আনলে দুপুরের রান্না হবে না। কতক্ষণ এই নিয়ে বসে থাকব বল।
বাবাই – আচ্ছা যাচ্ছি যাচ্ছি।
বাবাই ব্যাগ হাতে বাজারে বেরোয়। গানের কথা আর শোনা যায়না শুধু তানপুরায় সুরটা শোনা যায়। ক্যামেরা দরজা দিয়ে বাবাই এর বেরিয়ে যাওয়াটা ফলো করে। বাবাই বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়, সামনের বাড়িটার দিকে (যেখানে আগে গান শোনা যাচ্ছিল) একবার চকিতে তাকায়। গলির মোড়ে একটা নেড়া গাছ, যেরকম অনেকটা স্বপ্নে ছিল, ক্যামেরা তাতে ফোকাস করে।
ছবিটা ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

১৩ (১ মিনিটের শট)
ববিদের বাড়ির ড্রইংরুম।
(গৃহস্থালির সাধারন আওয়াজ)
ক্যামেরা খাবার টেবিলে ফোকাস করে। ছড়ানো ছিটনো খাবারের প্লেট ঠেলে ববি উঠে পড়ে।
মা - টিফিনটা নিতে ভুলিসনা...।
ববি – হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। (ববি ব্যাস্ত ভাবে অফিসের ব্যাগ গুছিয়ে নেয়)
মা – আজ আবার সুদেষ্ণারা আসবে না তোর নতুন ফ্ল্যাট দেখতে।
ববি – হ্যাঁ... তো। ওনিয়ে তোমাদের ভাবতে হবে না। যা করার আমি করে নেব।
ববি ব্যস্ত ভাবে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। দুম করে দরজাটা বন্ধ হয়ে যায়। ক্যামেরা ববির বেরিয়ে যাওয়া এবং দরজা বন্ধ হওয়াটা ফলো করে। বন্ধ দরজার দিকে মুখ করে মা দাঁড়িয়ে থাকে।
(বেহালায় একটা করুণ সুর বাজতে থাকে)

১৪ (৪ মিনিটের শট)
(রাস্তার সাধারন আওয়াজ।)
ববিকে নীচে পার্কি লটে দেখা যায়। একটা স্যান্ট্রো গাড়িতে ওঠে, ড্রাইভারের পাশের আসনে বসে, গাড়ি ছাড়ে। বাইরে বেরিয়েই এক বৃদ্ধ সাইকেল আরোহী হঠাৎ সামনে চলে আসে। ববির তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া...
ববি – ও ড্যাম, ব্লাডি ওল্ড ফুল।
বৃদ্ধ লোকটি পড়ে যেতে যেতে কোনরকমে সামলে নেয়। তারপর জিভ কেটে হাত জড়ো করে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গী করে। ববি সেটা পাত্তা দেয় না। দ্রুত গাড়ির কাঁচ নামিয়ে মুখ বার করে।

ববি – সুইসাইড যদি করতেই হয় তবে আমার গাড়ি কেন। সামনেই তো রেললাইন রয়েছে সেখানে গিয়ে গলা দাও না। কোথা থেকে যে আসে এইসব এইসব এলিমেন্ট... নাও নাও চলো চলো (ড্রাইভারকে বলে)।
ক্যামেরা গাড়ির ভেতর, পেছনের সিট থেকে সামনে ফোকাস করে।
বাইরে ট্রাফিক জ্যাম, ববি অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে।
ববি – শিট, এত জ্যাম হয় এই টাইমটায়। তারমধ্যে এই বাস গুলো। এই মুড়ির টিন গুলোকে আগে বসিয়ে দেওয়া উচিত।
ড্রাইভার – দাদা, সামনের সপ্তাহে দুদিন ছুটি চাই, গ্রামের বাড়ি যাব। আপনাকে আগে বলেছিলাম।
(বাঁশি আর কিবোর্ডে একটা হালকা সুর বাজে, কিছুটা রহস্যময়তা তৈরী হয়)
ববি – হ্যুঁ, সে আর কি করা যাবে। তবে দু দিনটা যেন দুদিনই থাকে, সেটা খেয়াল রেখো।... কোথায় তোমার গ্রামের বাড়ি?
ড্রাইভার – সুন্দরবনে...

ববি - সুন্দরবনে! ওখানে আবার গ্রাম টাম আছে নাকি?
(উত্তর নেই)... কি রমাপদ, আছে নাকি?
রমাপদ - আছে কটা...
ববি - তাতে মানুষ থাকে! (ঈষত বিরক্ত) সেবার যে আমরা টুরিজিমের লঞ্চে দুদিন সুন্দরবন ঘুরে এলাম, কই কোন গ্রাম তো দেখিনি, সুধুই তো জল আর জঙ্গল।
রমাপদ - (ড্রাইভারের সারা মুখে একটা অদ্ভুত ছায়া পড়ে, চোখ দুটো স্থির হয়) [ক্যামেরা রিয়ার ভিউ মিরারের ভেতর দিয়ে ড্রাইভারের মুখে ফোকাস করে] আছে দাদা, অনেক মানুষ আছে।
ববি - দেখিনি তো...
রমাপদ - কি করে দেখবেন দাদা, সুন্দরবনে তো মানুষ দেখতে কেউ যায় না, সবাই বাঘ দেখতে যায় (ড্রাইভারের চোখ দুটো জ্বলে ওঠে, যেন বাঘের মত)

(বাঁশির করুণ সুর বাজতে থাকে। গাড়ি চলতে থাকে, জোরে, বেহালার শব্দ ছাপিয়ে ইন্জিনের শব্দ শোনা যায়। হটাৎ জোরে ব্রেক করার শব্দ হয়।)
ছবিটা হঠাৎ করে অন্ধকার হয়ে যায়।

১৫ (৪০ সেকেণ্ডের শট)
অন্ধকারের ভেতর থেকে আবার ছবিটা ফুটে ওঠে।
আবার গাড়ি চলছে, সেক্টর ৫ এর বড়ো বাড়ি গুলো দেখা যায়
ববি - এত রেকলেসলি গাড়ি চালাও কেনো, কিসের তাড়া তোমার। আমি সত্যি ভেবে পাই না। এই করে আগের মাসেই ঘসা লাগিয়েছিলে। এতবার বলেছি... এভাবে চললে কিন্ত তোমাকে ছাড়িয়ে দেব, মনে রেখো।
ছবিটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়।

১৬ (৪ মিনিটের শট)

আগের ছবির ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে বাবাইদের পাড়া, পুরোনো কলকাতার সাধারন পথঘাট। চারপাশে ছোট বড়ো নানা রকম বাড়ি। রাস্তার কোনায় ফুটপাতের ধারে কয়েকটা ঝুপড়ি দোকান। চাএর দোকান, একটা মোবাইল রিচার্যের দোকান, পেছনে একফালি ছোট্টো মাঠ।
(পুরানো পাড়ার সকালের পাঁচমিশেলি শব্দ। বাঁশ বাঁধা, পেরেক ঠোকার শব্দ পাওয়া যায়। ধুনুরির আওয়াজ সঙ্গে লেপ তোষক তৈরি ওয়ালার ডাক ভেসে আসে কিছুটা দূর থেকে।)
বাবাই পাড়ার মোড়ের চায়ের দোকানে দাঁড়ায়, বাজারের ব্যাগটা হাতে। পেছন পেছন দুটো কুকুর লাফাতে লাফাতে আসে। দোকানের সামনে সেই নেড়া গাছটার তলায় আরও দুটো ছেলে আড্ডা মারছে।
ছেলে – কি বাবাই দা, কোথা থেকে, সকাল সকাল।

বাবাই – দেখতে পাচ্ছিসনা শালা, হাতে বাজারের ব্যাগ।
ছেলে – ভালো ভালো, বাড়ির কাজ কর।...
বাবাই – বাজে বকিস না, তার থেকে দেখ তো ওই ডেকরেটারের ছেলেগুলোর কি সব লাগবে বলছিল। দোকান খুললে এনে দে তো। কথার ফাঁকে বাবাই বিস্কুটের বোয়েম থেকে দুটো বিস্কুট বার করে, ভেঙে ভেঙে কুকুর দুটোকে খাওয়ায়।)
দোকানদার – বাবাই দা, অনেক বাকি হয়ে গেল কিন্তু, আগের মাসের টাও...
বাবাই – আরে ফোট, আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি।

এর মধ্যে একটা গাড়ি এসে দাঁড়ায়, কিছু একটা খোঁজ করে, বাবাই ধৈর্য ধরে, হাত নেড়ে রাস্তটা বুঝিয়ে দেয়। পেছনে একটা মণ্ডপ বাঁধার কাজ চলছে, তাদের কিছু টুকিটাকি নির্দেশ দেয়, একটা কাগজে কিছু এঁকে দেয়।
বাবাই – এই যে ডিজাইনটা করে দিলাম, প্যান্ডেলের মাথাটা কিন্তু ঠিক এরকম হবে। মনে থাকবেতো।
প্যান্ডেলওয়ালা – ঠিক আছে দাদা, হয়ে যাবে।
বাবাই – দেরি কোরনা, পরশুর মধ্যে কিন্তু কাজ শেষ করতে হবে।
এর মধ্যে আরও দুটো চোয়াড়ে চেহারার ছেলে এসে হাজির হয়, সাইকেল নিয়ে। তাদের সঙ্গে চাঁদা নিয়ে কিছু উত্তেজিত আলোচনা হয়। ভাষা আর ব্যবহারের লক্ষনীয় পরিবর্তন চোখে পড়ে।
বাবাই – কিরে, কালেকশান হচ্ছে?
ছেলে ১ – না দাদা, মার্কেট খুব খারাপ।
ছেলে ২ – সব শালা ভ্যানতাড়া মারছে, মাল ছাড়তে কেউ রাজি নয়।
বাবাই – সে বললে কি করে হবে। এদিকে সব অর্ডার হযে গেছে, প্যাণ্ডেল বেঁধে ফেলল। এখন আর ভ্যানতাড়া করলে হবে।
ছেলে ১ – কি করব দাদা, সবাই...
বাবাই – তোদের কি সেটাও বলে দিতে হবে। বিলটা কেটে দিয়ে ফেলে আসবি। কোন রকম হ্যাজাবিনা, বলবি পরে এসে দাদার নিয়ে যাবে, যা বলার তাদের বল।
ছেলে ২ – কত করে কাটব।
বাবাই – আরে গান্ডু, তোদের আগের বারের বিলগুলো দিলাম কেনো? আগের বারের ওপর ২০/৩০ টাকা বাড়িয়ে কেটে দিবি।
ছেলে ২ – ঠিক আছে দাদা, তাই করব।
বাবাই – আজকের মধ্যে অন্তত সামনের দোকান গুলোর সব কালেকশন কমপ্লিট কর।
তারা আবার সাইকেল নিয়ে হুস করে বেরিয়ে যায়।

(সেতারে আলাপের সুর, সকালের রাগ, বিলম্বিত...)
ব্যাগ নিয়ে বাড়ির পথে পা বাড়ায় বাবাই। সামনের একটা বাড়ি থেকে দামি গাড়ি নিয়ে বার হন এক ভদ্রলোক। প্রৌঢ়, প্রায় সাদা চুল, সাদা পাজামা পাঞ্জাবি, সোনার চেন, সোনালী ঘড়ি। চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট। ভদ্রলোক চালকের আসন থেকে নেমে বাড়ির গ্যারেজের দরজা লাগান, বাবাই এর সঙ্গে চোখাচোখি হতে হাসেন।
ভদ্রলোক - কাজ কর্ম কেমন চলছে?
বাবাই - কাজ আর কই দাদা, কাজই তো খুঁজছি।
ভদ্রলোক - না,না সে কথা বলছিনা, ওই কাজ ঠিকই পেয়ে যাবে... ছবি আঁকা চলছে, স্কালপচার...
বাবাই - ওই আরকি...কোন মতে।
ভদ্রলোক – কোন মতে কেন?
বাবাই - ভালো লাগেনা...কি হবে কাজ করে।
ভদ্রলোক - না,না কাজ করা একদম বন্ধ কোরনা, ভালো কাজ একদিন ঠিকই সকলের সামনে আসবে। ভ্যানগগের কথাই ধরো...
গাড়িটা জোরে হর্ণ দেয়, জানলায় এক অসহিষ্ণু মহিলার মুখ, ইশারায় তাড়া দেয়
ভদ্রলোক - ঠিক আছে, আজ চলি। একদিন তোমার বাড়ি যাব, তোমার কাজ দেখতে
ভদ্রলোক গাড়িতে উঠে চলে যান, দামি গাড়িটা গলির বাঁকে হারিয়ে যায়, বাবাই তাকিয়ে থাকে।
(সেতারের সুর দ্রুত এবং স্পস্ট হয়) বাবাই ধীর পায়ে হাঁটতে থাকে। ক্যামেরা পেছন থেকে হতাশ পদক্ষেপটা অনুসরণ করে। রাস্তা শুকনো পাতায় ভোরে আছে, তার মধ্যে দিয়ে বাবাই হেঁটে যায়, শেষে একটা বাঁকের আড়ালে হারিয়ে যায়। হাওয়ার ঝাপটায় শুকনো পাতাগুলো একধার থেকে অন্য ধারে উড়ে যায়।
ছবিটা ঝাপসা হয়ে মুছে যায়।

১৭ (৩:৩০ মিনিটের শট)
বাবাই দের বাড়ি, আগের ছবির ভেতর থেকে ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে। ভেতর থেকে দরজার দিকটা দেখা যায়।(গৃহস্থালির সাধারন শব্দ, রান্নার শব্দ শোনা যায়।)
বাড়িতে ফেরে বাবাই। ক্যামেরা দরজায় ফোকাস করে, দরজা ঠেলে ব্যাগ হাতে ভেতরে আসে বাবাই। দরজার পাশে চটি খুলে রাখে, বাজারের ব্যাগটা নামিয়ে, পাশে রাখা একটা আধখানা হওয়া মাটির স্কালপচারের গায়ে হাত বোলাতে থাকে পরম মমতায়। (সেতারের সুরের রেশটা লেগে থাকে) রান্নাঘর থেকে মা ঝাঁঝিয়ে ওঠে। (সুরটা কেটে যায়)

মা – দুটো বাজার করতে এতক্ষন লাগে, হেঁসেল আগলে কতক্ষন বসে থাকবো। নিশ্চই পাড়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছিলি।
(বাবাই রান্নাঘরে এসে বাজারের ব্যাগ থেকে জিনিস গুলো বার করে ঝুড়িতে গুছিয়ে রাখে। মুখে কিছু বলেনা, শুধু একটু মৃদু হাসে, তৃপ্তির হাসি।) – তোকে আমি জানিনা, ঠিক জানি... কাজ কর্মের চন্তা নেই সারাদিন ভুতের ব্যাগার খেটে বেড়া... (গলার স্বরে প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় মিশে থাকে।)- আজ আমাকে এখুনি আবার বেরোতে হবে। নতুন লটের শাড়ি গুলো এসেছে, সেগুলো তুলতে যেতে হবে।... সংসারটার দিকে কারুর কি কোন খেয়াল আছে... (মনে মনে গজগজ করতে থাকে)
(সন্তুরে একটা কোমল সুর বাজে) মা থালায় করে গরম রুটি তরকারি দেয়, মেয়েকে ডাকে। হাতে একটা ঝাড়ন নিয়ে বোন আসে, হাত ধোয়। দুজনে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে খেতে থাকে। জানলা দিয়ে একফালি রোদ এসে পড়ে দুজনের পায়ের কাছে। (কথা শুরু হলে ধীরে ধীরে সুরটা মিলিয়ে যায়)
বাবাই – সকাল সকাল ঝাড়ন নিয়ে কি করছিলি, কলেজ নেই?
বোন - না আজ ছুটি। ভাবছিলাম আজ ছাদের ঘরটা একটু পরিস্কার করি। অনেকদিন ধরে পড়ে আছে।
(সবাই চুপচাপ, মা একবার আঁচলের খুঁটে চোখ মোছে। বোন উঠে গিয়ে হাত ধোয়। হঠাৎ করে ফিরে তাকায়)
বোন – হ্যাঁ রে দাদা, তোর আজকে একটা ইন্টারভিউ ছিল না!
বাবাই - হ্যাঁ ছিল... যাব না।
বোন - সেকি, কেন!
মা – কেন রে যাবিনা কেন?
বাবাই - কি হবে গিয়ে।
মা - মানে।
বাবাই - কিচ্ছু লাভ হবে না, এগুলো সব ঠিক করা থাকে ভেতর থেকে। লোক দেখানো ইন্টারভিউ...
বোন - তবু একবার দেখইনা গিয়ে, তোকে কল তো দিয়েছে।
বাবাই - তো কি, সে তো কত জনকেই হয়ত দিয়েছে, নেবে তো বড়জোর দু তিন জন।
মা – সেই জন্যই তো তোকে কবে থেকে বলছি একবার তোর মেশোর কাছে যা, কথা বল। অত বড়ো লোক, ঠিক একটা ব্যবস্থা করে দেবে।
বাবাই - একদম না, মা তোমাকে আমি অনেকবার বারন করেছি। কোন দরকার নেই ওদের সাহায্য নেওয়ার। (হঠাত রেগে যায় বাবাই) যা হবার তাই হবে। আর তোমাকেও বলে রাখছি, আমার ব্যাপারে, আমার কাজের ব্যাপারে ওদের সঙ্গে কোন আলোচনা করার দরকার নেই।
বোন এরমধ্যে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যায়। বাবাই রাগ করে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যায়। (সেতারে একটা করুণ সুর আবার বাজতে থাকে) মা বসে থাকে, একবার চোখ মোছে।... একটু পরে বাবাইকে দেখা যায় ঘর থেকে একটা পরিস্কার জামা প্যান্ট পরে বেরিয়ে আসতে। মা অবাক হয়ে তাকায়।
মা – কি রে, কোথায় চললি আবার।
বাবাই - যাই, দিয়ে আসি ইন্টারভিউটা
মা - আরে, তবে খেয়ে যা, কখন ফিরবি ঠিক আছে। আগে বলবি তো...
বাবাই - আরে ওইসব খাওয়া ফাওয়া ছাড়ো তো, যদি বেশী দেরি হয়, খেয়ে নেব অখন কিছু বাইরে।
বাবাই দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যায়।
(সেতারের সুরটা পেছনে শোনা যায়।)
ক্যামেরা পেছন থেকে বাবাই এর ওপরে উঠে যাওয়াটা অনুসরণ করে, তারপরে সিঁড়ির বাঁকে হারিয়ে যায়।

১৮ (২ মিনিটের শট)
ছাদের ঘরে সিঁড়ির সামনে থেকে ক্যামেরা ঘরের ভেতরটা দেখায়।

(সেতারের সুরটা পেছনে শোনা যায়।)
ছাদ সংলগ্ন ছোট্ট একটা চিলেকোঠা ঘর, চারিদিকে অনেক পুরোনো পুরোনো বই, হাবিযাবি অনেকে জিনিস ছড়ানো। একধারে কএকটা ছোট প্যাকিং বাক্স। একধারে জানলার পাশে একটা ছোট টেবিল, তাতে লেখার সরঞ্জাম। সবই ধুলি ধুসরিত। মাঝখানে বোন জিনিসপত্র ঝাড়াঝাড়িতে ব্যাস্ত। দাদার দিকে অবাক হয়ে তাকায়।
বাবাই - যাই দিয়ে আসি ইন্টারভিউটা, তোরা বলছিস যখন।
বোন - যা, ভালো করে দে, মাথা গরম করিসনা।
(সেতার আর বেহালার করুণ সুরটা বাজতে থাকে)
দুজনে চুপকরে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে, চোখে মুখে বিষণ্ণতার ছায়া পড়ে গাঢ় হয়ে। ক্যামেরা দুজনের মুখ ধরে ক্লোজশটে। বোনের চোখের কোনে জল চিকচিক করে ওঠে।
বোন – এই ঘরটাতে এলেই মনটা এত খারাপ হয়ে যায়... মনে হয় যেন এইতো বসে ছিল, কোথাও উঠে গেছে। ... এই ঘরের সবকিছুতে এখনো যেন বাবার গন্ধ লেগে আছে।

দুজনে চুপচাপ, বোনের চোখ দিয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। বাবাই ওর মাথায় হাত রাখে।
বাবাই - মন খারাপ করিসনা... চারপাশের এই পাঁক আর পচা ডোবার মধ্যে একটা লোক তো সারাজীবন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের গর্ব করা উচিত।
বোনের চোখ দিয়ে আবার দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। হঠাত ছটফট করে ওঠে।
বোন - যা, যা, তোর দেরি হয়ে যাচ্ছে।
দুজনেই যেন বাস্তবে ফিরে আসে, বাবাই দ্রুত পা বাড়ায় সিঁড়ির দিকে।
(সেতারের সুরটা মিলিয়ে যায়)
বোন – বেস্ট অফ লাক...
নীচে নেমে যেতে যেতে মাকে বলে –
বাবাই - আমার খাবারটা চাপা দিয়ে রেখে দিও, এসে খেয়ে নেবো...
(সন্তুরে একটা হালকা সুর বেজে ওঠে, খুশির সুর)
বাবাই দ্রুত বেরিয়ে যায়, ক্যামেরা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়াটা ফলো করে, তারপর আবার মার ওপর ফোকাস করে। মার মুখে এখন মৃদু হাসি, তৃপ্তির, অস্ফুটে বলে... – দুগ্গা দুগ্গা... পাগোল ছেলে
(সেতারের সুরটার সঙ্গে পিয়েনোর সুর মিশে কিছুটা রহস্যময়তা তৈরি হয়)
ক্যামেরা আবার ছাদের ঘরে ফিরে আসে, চারিদিকে জিনিসপত্র ছড়িয়ে বোন বসে আছে। হাতে ধরা একটা চশমার বাক্স, ভেলভেটের। ভেতরে একটা সাধারন দেখতে চশমা। ক্যামেরা সেটার ওপর জুম করতে থাকে।
ছবিটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়।

১৯ (১:৩০ মিনিটের শট)
ববিদের অফিসের ভেতর।

আই টি কম্পানীর ঝাঁ চকচকে একটা ফ্লোর। এধার ওধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু লোক। সবাই ঘাড় নিচু করে কম্পিউটারে কাজ করে চলছে। এক কোনায় ববির ডেস্ক, কম্পিউটারে মনোযোগ দিয়ে কিছু দেখছে ববি। ক্যামেরা ধীরে ধীরে স্ক্রিনের ওপর জুম করে, দেখা যায় শেয়ারের সাইট খোলা। একজন সহকর্মী পাশের ডেস্ক থেকে উঠে আসে।
সহকর্মী ১ - এই তো শুরু হয়ে গেল...
ববি - আরে দাঁড়াও, আজ মার্কেট ৬০ পয়েন্টের ওপর আপ আছে। বালচিনির স্টকটা আজই ছেড়ে দেব।
আরও কিছু লোক এসে জড়ো হয়, শেয়ার নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। একসময় আলোচনা সেয়ার ছাড়িয়ে দেশের অর্থনীতিতে ঢুকে পড়ে।
সহকর্মী ১ – হ্যাঁ অনেকদিন পরে এই সপ্তাহে মার্কেটটা একটু রিকভার করছে।
সহকর্মী ২ – থাকবে না, আবার পড়ে যাবে। বাজেট অবধি এরকমই চলবে। তারপরে বাজেটে কি হয় তার ওপর।
ববি – কি আবার হবে। যা হবে সে তো জানাই।... ট্যাক্স স্ট্রাকচারে কোন চেঞ্জ হবে না, উল্টে দুএকটা সারচার্য বাড়তে পারে। মাঝখানে আরও একবার পেট্রোলের দাম বাড়বে। আর হাবিযাবি কিছু সাবসিডি, পলিটিক্যাল প্রেসারে... যেমন চলছে তেমনই চলবে।
সহকর্মী ১ – এগজ্যাকটলি, আর এর পুরো লোডটা ইনডাইরেক্টলি আমাদের ওপর এসে পড়বে।
নীল শার্ট আর ধুসর প্যান্ট পরা একজন, যে এতক্ষণ ডেস্কে বসে কাজ করছিল, কিছু একটা শেষ করে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ায়।
নীল শার্ট - একটা জিনিস ভুলে গেলে চলবে না, এদেশে কিন্তু শুধু তোমার আমার আর ববির মত লোকেরাই থাকে তা নয়...
ববি – তুমি কি এইট্টি টোয়েন্টি রুলটা ভুলে গেলে, সব সময় এই ২০পারসেন্ট লোকই কিন্তু ডিসাইসিভ।
নীল শার্ট - চলো চলো, চা খেয়ে আসা যাক। দেখা যাক বাকি ৮০পারসেন্ট লোক কি করছে।
সকলে হেসে ওঠে, একদল লোক কিউবিকিলের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে বেরিয়ে যায়।
(হাঁটার তালে তালে একটা বিট বাজতে থাকে)

২০ (২:৩০ মিনিটের শট)
তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প তালুক, ববিদের অফিস পাড়া।
(অফিস পাড়ার স্বাভাবিক শব্দ, তার সঙ্গে ড্রাম বিট বাজতে থাকে)
ক্যামেরা একটা বিশাল অফিস কম্পেক্সের গেটের সামনে সোজা ফোকাস করে। সেই দলটা ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে একইরকম এঁকেবেঁকে। সবারই ঝকঝকে অফিস ড্রেস, হালকা রঙের জামা, কালো প্যান্ট, গলায় ট্যাগ। একজনের গায়ে শুধু গাঢ় নীল রঙের জামা, ধুসর প্যান্ট। ক্যামেরা ধীরে ধীরে জুম আউট করে, অফিস পাড়ার সামগ্রিক ছবিটা ফুটে ওঠে। রাস্তার উল্টোদিকে একটা বড়ো বাড়ির কনস্ট্রাকশন চলছে। তারথেকে বেরিয়ে আসা জল কাদা জমে আছে উল্টোদিকের রাস্তায়। তার সামনে অনেক ঝুপড়ি দোকান, নোংরা

পরিবেশ। তার মধ্যে ইতস্তত কিছু লোক দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে। কয়েকটা দামি গাড়ি দাঁড় করানো উল্টোদিকের রাস্তার ধারে। সবমিলিয়ে রাস্তার দুধারের পরিবেশের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ চোখে পড়ে।
ক্যামেরা আবার দলটাকে ফলো করে, তারপর শুধু কোমর থেকে পা গুলোকে ধরে ক্লোজ শটে। দেখা যায় একজোড়া পা অদ্ভুত ভাবে কাদা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করছে। শেষে একবার কাদার মধ্যে পড়ে। ক্যামেরা এবার পুরো চেহারাটা ধরে, ববির চোখে মুখে একরাশ বিরক্তি।

ববি - এই জন্য আমি বাইরে বেরোতে চাইনা। ডিসগাসটিং... পাবলিক প্লেস ইউজ করে এভাবে কেউ কন্সট্রাকশন করতে দেয়। বাইরে এরকম হচ্ছে ভাবতে পারবে, সেখানেও তো কন্সট্রাকশন কম হচ্ছেনা।
দুএক জন সায় দেয়, নীল সার্ট মুখ টিপে হাসে, চোখে কৌতুক। আলোচনা চলতে থাকে, কন্সট্রাকশন থেকে একসময় সেটা রিয়াল এস্টেটের দিকে ঘুরে যায়, আলাপচারিতা চলতে থাকে। এর মাঝে চা আসে, কেউ কেউ সিগারেট ধরায়।
সহকর্মী ১ – হ্যাঁ সত্যি, এদের কোনরকম সিভিক সেন্স নেই। রাস্তাটার কি হাল করে রেখেছে।
সহকর্মী ২ – কিন্তু কেউ কিছু বলার নেই। দেশে কোন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে বলে মনে হয়না।
সহকর্মী ১ – আরে এদের কথা ছাড়ো, এরা তো বিগ নেমস, এদের কে কি বলবে। আমাদের পাড়াতে এভরি আদার পুরোনো বাড়ি ভেঙে এখন প্রোমোটাররা ফ্ল্যাট তুলছে। সেম সিচুয়েসান। গাড়ি তো দুরের কথা, পায়ে হেঁটে যাবার পর্যন্ত উপায় নেই।... কেউ কিছু বলতে পারেনা।
সহকর্মী ৩ – কেনো।
সহকর্মী ১ – কি করে করবে, সব লোকাল কমিটিকে হাত করে রাখে পয়সা খাইয়ে। পাড়ার ক্লাব গুলোকে হাত করে রেখেছে। কে কি বলবে, পাড়ায় তো থাকতে হবে।
সহকর্মী ২ – সে যা বলেছো। ইটস অ্যা বিগ বিজনেস নাউ।... ম্যাক্সিমাম ১৫-২০ লাখ টাকা কাঠায় জমি তুলে নিচ্ছে এরা। ডিসপিউটেড হলে তো আরও অনেক কমে। তারপর টাকাপয়সা খাইয়ে সব পেপার বার করে নিচ্ছে ব্যাস। ... তারপর একটা জি প্লাস ফোর, বড়ো রাস্তার ধারে হলে আরও বেশী।... একএকটা ফ্ল্যাট মিনিমাম ৩০লাখ। এবার তাহলে হিসেব করে দেখো।
সহকর্মী ৩ – হ্যাঁ সত্যি, রিয়াল এস্টেটের দাম যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে...। আমি কদিন আগে গড়িয়ার ওদিকে একটু খোঁজ করছিলাম, আর একজনের জন্য... মিনিমাম পার স্কোয়ারফিট তিন হাজার, কমপ্লেক্সের ভেতর হলে আরও বেশী।
সহকর্মী ১ – চিন্তা করা যায়, গড়িয়ার ওপারে মানে প্র্যাকটিকালি কলকাতার বাইরে। সেখানেই এই অবস্থা। তাহলে আর আমাদের রাজারহাটে সাড়ে তিন হবে না কেন।
এর মধ্যে দুটো কুকুর এসে ওদের চারপাসে ঘুরঘুর করে। দেখা যায় ববি অস্বস্তি বোধ করছে। একসময় একটা কুকুর ববির গা ঘেঁসে দাঁড়ায়। ববি কিছুটা ভয় পেয়ে হাত তুলে সেটাকে তাড়ানোর চেষ্টা করে, কুকুরটা উল্টে দাঁত বার করে ডাক দেয়। এবার দোকানদার ছেলেটা এসে কুকুরটাকে একটা লাথি মারে। কেঁই কেঁই করে কুকুরটা পালায়।
ববি – থ্যাঙ্ক গড, দেখেছিলে কুকুরটার লেজটা কেমন সোজা হয়ে গেছে। নির্ঘাত পাগলা কুকুর, কামড়ালেই শেষ। তারপর সেই ড্যাম ইনজেক্সান গুলো...
কয়েকজন হেসে ওঠে।
ববির পাশে একজন দাঁড়িয়ে ঘনিষ্ট ভাবে কথা বলে।
(কিবোর্ডে একটা হালকা সুর বাজে, কিছুটা রহস্যময়তা তৈরি হয়)
ববির বন্ধু - হ্যাঁরে, তোর আজকে নতুন ফ্ল্যাটটা দেখতে যাওয়ার কথা ছিলনা।
ববি - হ্যাঁ তো, এখুনি সুদেষ্ণারা আসবে গাড়ি নিয়ে। ওর বাবা মার ও আজ দেখতে যাবার কথা। ওরাও তো আর একটা ফ্ল্যাট বুক করেছে ওই কমপ্লেক্সে।
ববির বন্ধু - তাই নাকি, খুব ভালো। ওরকম শশুরের যত কাছাকাছি থাকা যায় ততই ভালো। (দুজনে হাসে। একটু থেমে) আমার ব্যাপারটা ভুলে যাসনা যেন।
এরমধ্যে ববির মোবাইলে একটা ফোন আসে।
ববি - ওরা এসে গেছে কাছাকাছি, আমি এগোলাম...
ববি দ্রুত পায়ে বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে যায়। নীল সার্ট একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। মুখে কৌতুক আর বিতৃষ্ণা মাখানো একটা হাসি লেগে থাকে।
(অফিস পাড়ার শব্দের সঙ্গে মিশে একটা পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুর বাজতে থাকে)
ছবিটা মিলিয়ে গিয়ে পরের দৃশ্যটা ভেসে ওঠে।

২১ (১ মিনিটের শট)
আগের দৃশ্যের ভেতর দিয়ে ববির দ্রুত হেঁটে যাওয়াটা ফুটে ওঠে।
(অফিস পাড়ার শব্দের সঙ্গে মিশে পাশ্চাত্য সঙ্গিতের সুরটা বাজতে থাকে)
ক্যামেরা ববির যাওয়াটা ফলো করতে থাকে। সামনে একটা বড়ো রাস্তার মোড়। ববি দ্রুত চলতে চলতে জুতোটা একবার প্যান্টের পেছনে ঘসে মুছে নেয়। এই সময় একটা দুধসাদা বিশাল হণ্ডা অ্যাকর্ড সামনে দিয়ে গিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়ায়। পেছনের জানলা নামিয়ে একটা মেয়ে হাত নাড়ে, কাগজের মত সাদা গোলগাল চেহারা। পেছনে তার পাশে মা, সামনের সিটে পুরোদস্তুর সাহেবী পোশাকে বাবা। দুজনের চেহারাই অত্যন্ত অভিজাত।
মেয়ে দরজা খুলে দেয়।
ববি উঠে আসে, মেয়েটি মিস্টি হাসে, ববিকে কিছুটা নার্ভাস মনে হয়, একটু বোকা বোকা হাসে। পেছনের সিটে বসে, একটু সংকুচিত ভাবে। গাড়ি ছেড়ে দেয়।
ক্যামেরা গাড়ির ভেতরে।
মা - কেমন আছ বাবা, সব ভালো তো।
বাবা – (হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে, গম্ভীর জোরাল গলায় কথা বলে।) হাউ আর ইউ ডুইং ইয়ং ম্যান।
ববি - ফাইন স্যার...
মেয়ে – (ফিক করে হেঁসে ফেলে। কনুই দিয়ে একটা মৃদু খোঁচা দেয় ববিকে।) এখনো স্যার...
মা ও মৃদু হাসে, জানলা দিয়ে উল্টোদিকে চেয়ে থাকে।
বাবা – হাউ ইজ ইওর ড্যাড ডুইং, সে হ্যালো টু হিম অন মাই বিহাফ
(পাশ্চাত্য গানের সুরটা স্পষ্ট শোনা যায়, সঙ্গে গিটার এবং ড্রাম বিটস)
ক্যামেরা জুম আউট করতে করতে দূরে চলে যায়। লংশটে গাড়িটাকে ধরে রাখে। রাজারহাটের ঝাঁ চকচকে রাস্তা, দুপাশে উঁচু বাড়ির সারি। একসময় গাড়িটা বাঁদিকে ঘুরে যায়, দুরে অনেকগুলো নির্মীয়মান বহুতল চোখে পড়ে। গাড়িটা দ্রুত সেদিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

২২ (৩০ সেকেণ্ডের শট)

নির্মীয়মান একটি বিশাল আবাসন চত্তর, বিলাসবহুল গাড়িটিকে সেদিকে দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখা যায়।
(পাশ্চাত্য গানের সুরটা বাজতে থাকে)
ক্যামেরা নির্মীয়মান বহুতলের ওপর থেকে ফোকাস করে। বিশাল একটা প্রোজেক্টের আভাস পাওয়া যায়। প্রোজেক্ট এরিয়ার গেটের বাইরে কতকগুলো বিবর্ণ নেড়া গাছ, তারই একটা গাছের ডালে একটা ছেঁড়া ঘুড়ি আটকে আছে দেখা যায়। ক্যামেরা সেই নেড়া গাছ আর ছেঁড়া ঘুড়ির ফাঁক দিয়ে গাড়িটার এগিয়ে আসাটা ফলো করে। গাড়িটা প্রোজেক্ট এরিয়ার গেটের সামনে এসে দাঁড়ায়, সিকিউরিটি গেট খুলে দাঁড়ায়। সবাই গাড়ি থেকে নেমে আসে। প্রোজেক্ট অফিস থেকে দুএক জনকে ব্যস্ত ভাবে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। সবাই ব্যস্ত ভাবে বাড়ির ভেতর ঢুকে যায়।
(সুরটা মিলিয়ে যায়)

২৩ (৫ মিনিটের শট)
ববিদের নির্মীয়মান ফ্ল্যাট।
(কনস্ট্রাকশনের পাঁচমিশেলি শব্দ)
একটা প্রায় শেষ হয়ে আসা ফ্ল্যাটের ভেতর সবাইকে দেখা যায়। মেয়ে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন জিনিস দেখতে থাকে। ববি তার পেছন পেছন যায়। ফ্ল্যাটের কোথায় কি বসান হবে, কি থাকবে এসব নিয়ে কথা চলতে থাকে। সুদেষ্ণাই বেশীর ভাগ কথা বলতে থাকে। ববি মূলত সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়ে। দুএকটা কথা যোগ করে। সঙ্গে বিল্ডারের একজন লোক, সবকিছু নোট কোরে নিতে থাকে।
সুদেষ্ণা – আচ্ছা এখানে ড্রইং আর ডাইনিং এর মাঝে একটা হাফ পার্টিশান দেবার কথা ছিলনা।
নিতাই – হ্যাঁ ম্যাডাম, ওটা আমরা লাস্টে বসিয়ে দেব।
সুদেষ্ণা – ঠিক আছে, ভুলে যাবেন না। (সুদেষ্ণা বেডরুমে ঢোকে। জানলাটা দেখে, ববিকে দেখায়) এইটা বেশ ভালো লাগছে বল... এই পুরো ওয়ালটা জানলা হওয়াতে অনেক ওয়াইড লাগছে ঘরটা।
ববি – হ্যাঁ দারুণ লাগছে, এদিকের ভিউটাও ঠিক আছে।
সুদেষ্ণা – (বেডরুম থেকে বেরিয়ে বাথরুমে ঢোকে) আরে এটা লাগিয়েছো কেনো। বলেছিলাম না এটাতে রেন সাওয়ার লাগাতে।... এটা হবে না, চেঞ্জ করতে হবে।
নিতাই – ঠিক আছে ম্যাডাম, এটা আমরা পাল্টে দেবো। আমি লিখে রাখছি।
সুদেষ্ণা – পার্টিশান ওয়ালটাও লিখে রাখ। (বাথরুম থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরে ঢোকে, ড্রয়ার গুলো টেনে দেখে) আরে ভেতরের ট্রে গুলো কোথায়, দেয়নি তো।

নিতাই – ওরা এখনো মডিউলার কিচেনের কাজ ফিনিস করেনি ম্যাডাম। দিয়ে দেবে।
সুদেষ্ণা – না, না তুমি লিখে রাখ। নাহলে ফাইনালি সেই ভুলে যাবে।
ড্রইংরুম, বেডরুম, বাথরুম, কিচেন... সব যায়গায় দ্রুত ক্যামেরা ঘুরে আসে, দেখা যায় কিছু লোক কাজ করছে। তারা এদের আগমনে একেবারে ভ্রুক্ষেপহীন। ড্রইং রুমে দেখা যায় ইন্টিরিয়র ডেকরেটিংএর কাজ হচ্ছে। এককোনে একটা বিশাল সোফাসেট পড়ে আছে, সেলোফিন মোড়া। দেওয়ালে দুএকটা ছবি লাগানোর কাজ চলছে।
ড্রইংরুমের মাঝখানে বাবা মা দাঁড়িয়ে, একজন ম্যানেজার গোছের লোক এসে হাত কচলে দাঁড়ায়, মা কে মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার করে। ইসারায় একজনকে ডাকে, চারটে কোল্ডড্রিঙ্কের বোতল নিয়ে একজন এসে দাঁড়ায়।
ম্যানেজার - নিন স্যার, একটু ঠাণ্ডা...
বাবা মা হাত নেড়ে বারন করে, সুদেষ্ণা একটা বোতল তুলে নেয়, দেখাদেখি ববিও একটা নেয়।
ম্যানেজার - স্যার তা হলে চা বা কফি
বাবা - না না ইন্দ্রনীল ওসব কিছু লাগবে না। শোনো এখনোতো দেখছি অনেক কাজ বাকি... সামনের মাসের মধ্যে সবকিছু শেষ হবে?
ম্যানেজার - হ্যাঁ স্যার, এখন দু শিফ্টে কাজ হচ্ছে, খুব তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে যাবে। আপনি কোন চিন্তা করবেননা স্যার।
বাবা - দেখ, আমার মেয়ে আর হবু জামাই (হাত তুলে ওদের দিকে দেখায়, ইন্দ্রনীল ওদেরও মাথা ঝুকিয়ে নমস্কার করে) ওদেরই ফ্ল্যাট এটা, জান তো।
ম্যানেজার - হ্যাঁ স্যার, অবশ্যই...
বাবা - সামনের মাসের পরের মাসে ওদের রিশেপসান, তার আগে যেন সব রেডি হয়ে যায়।
ম্যানেজার - তার অনেক আগেই হয়ে যাবে স্যার... এই নিতাই, তুমি ম্যাডামের রিকোয়ারমেন্ট গুলো নোট করে নিয়েছো তো। (নিতাই ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলে, হাতে নোট করা কাগজটা এগিয়ে দেয়। ইন্দ্রনীল একবার চোখবুলিয়েই বলে ওঠে) হয়ে যাবে ম্যাডাম, কোন চিন্তা করবেন না। (চিন্তা করবেন না, এই শব্দবন্ধটি লোকটির মুদ্রাদোষ বলে মনে হয়।)
বাবা - তোমার কাছে কেজরিওয়ালের নাম্বার আছে। আই ডোন্টওয়ান্ট টু টেক এনি চান্সেস নাউ (স্বগতোক্তির মত বলে)।
ম্যানেজার - বড়ো স্যারের নাম্বার, না তো... (ইন্দ্রনীল কেমন যেন ভয় পেয়ে যায়। একটু ভেবে বলে) হ্যাঁ হ্যাঁ এই কার্ডটাতে বোধহয় আছে। (ব্যস্তভাবে মানিব্যাগ থেকে খুঁজে একটা কার্ড বার করে, একবার চোখ বুলিয়ে এগিয়ে দেয়। কার্ডটা হাতে নিয়ে মি: রায় এগিয়ে যায় ড্রইংরুম সংলগ্ন বারান্দার দিকে।)
বাবা - ঠিক আছে।
(বাঁশি আর বেহালার একটা মিশ্র করুণ সুর ধীরে ধীরে শোনা যায়)

ক্যামেরা এবার বারান্দা দিয়ে বাইরে ফোকাস করে। দূরে চারধারে শহরের আকাশ রেখা চোখে পড়ে। ক্যামেরা এবার ধীরে ধীরে নীচে নেমে আসে, দেখা যায় আসপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু গ্রামের ঘরবাড়ি। টালির চাল, টিনের চাল, ছোট ডোবা, সেখানে লোকে চান করছে, কাপড় কাচছে। বাড়িগুলোর সামনে ফাঁকা যায়গায় কিছু গরুছাগল ইতস্তত চরছে। একটা বাড়ির সামনে পুকুরের পাড়ে একটা গাছের ডাল থেকে ঝোলান একটা টায়ার, তাতে খালি গা একটা ছেলে দোল খাচ্ছে মনের সুখে। একদল বাচ্চা পুকুরের জলে ঝাঁপ দিল। সবমিলিয়ে, সতস্ফূর্ত জীবনযাত্রার এক অনাবিল ছবি। বহুতলের অনেক ওপর থেকে ক্যামেরা ফোকাস করে, বিশেষ করে ছেলেটার দুর্দান্ত দোল খাওয়াটা। একসময় ক্যামেরা ধীরে ধীরে পিছিয়ে আসে আবার বারান্দায়, দেখা যায় মি: রায়ের চোখে গভীর ভ্রুকুটি। ইন্দ্রনীলের দিকে ফেরে।
বাবা - এদিকে এখনো একইরকম রয়েছে! আর কোন অ্যাকুইজিশান হয়নি? (সবাই চুপচাপ, অস্বস্তিকর নৈস্তব্ধ)। তবে যে কেজরিওয়াল আমাকে বলেছিল সামনে ওদের আর একটা আরও বড়ো প্রোজেক্ট হবে। আরও সব কার কার কি কি হবে, অনেক গল্প শুনিয়েছিল।
ম্যানেজার - (ইন্দ্রনীল জোরকরে কথা বলে ওঠে, আগের থেকে জোর গলায়) হ্যাঁ স্যার, এসব কিচ্ছু থাকবে না। এসব জমি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। প্রাইভেট প্রোমোটাররা যে যতটা পারছে জমি তুলে নিচ্ছে। আমাদের প্রোজেক্টের জন্যও জমি দেখা চলছে স্যার, এর সামনেই হবে। (হাত নেড়ে দেখায়) ওই পর্যন্ত মার্কিংএর কথা আছে। তার ওপাশটা স্যার পালনজিদের।
বাবা - তো কোথায়, কোন তো চিহ্ন দেখতে পাচ্ছিনা।
ম্যানেজার - আসলে স্যার এখন সামনেই পঞ্চায়েত ইলেকশান তো, কোনো বড়ো প্রোজেক্টকে এখন জমি একোয়ার করতে দিচ্ছেনা। একবার ইলেকশানটা মিটে গেলেই পটাপট সব হয়ে যাবে। আমাদের সঙ্গে লোকাল আর স্টেট লেভেলে সব কথা হয়ে আছে। আপনিতো স্যার সবই জানেন...
(সুরটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়)

মি: রায়কে একটু আশস্ত মনে হয়। সবাই ধীরে ধীরে ফ্ল্যাটের দরজার দিকে বেরিয়ে যায়। ভেতরে যে কাজের শব্দ আগে শোনা যাচ্ছিল এখন তা একেবারে চুপচাপ। দরজার কাছ থেকে মি: রায় আবার বলেন–
বাবা – যা বলেছি মনে আছে তো। আবার বলছি, এটা আমার মেয়ে জামাইয়ের ফ্ল্যাট, কাজ যেন কোন ভাবেই খারাপ না হয়। এটা আমার ডুপ্লেক্সটার থেকেও ভালো করে করতে হবে।... কোন সমস্যা হলেই আমাকে জানাবে।
ম্যানেজার – হ্যাঁ স্যার, আপনি কোন চিন্তা করবেন না।
সুদেষ্ণা আবার ফিক করে হেঁসে ফেলে। সকলে ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে যায়।
(করুণ সুরটা বাজতে থাকে দ্রুত লয়ে)

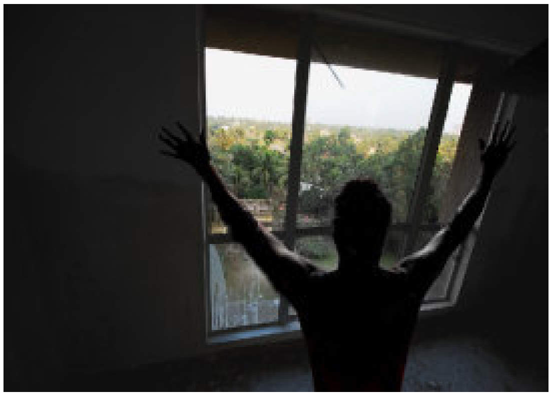

ক্যামেরা ফ্ল্যাটের বেডরুমের ভেতর ফিরে আসে। কুচকুচে কালো পেটানো চেহারার একজন মিস্ত্রি জানলার গ্রীল ধরে দাঁড়িয়ে অপলকে তাকিয়ে আছে গ্রামটার দিকে। ছেলেটাকে দেখা যায় অনেক নীচে এখনো দোল খেয়ে চলেছে। পেছনে অন্য মিস্ত্রিদের গলার আওয়াজ পাওয়া যায়।
মিস্ত্রি – কিরে কালু, শুনলি...
ক্যামেরা পেছন থেকে কালুকে ফোকাস করে, মুখের পাশ আর হাতটা। গ্রীলটা মুঠো করে ধরা। ক্রমশ হাতের চাপ বাড়তে থাকে, হাতের শিরা গুলো ক্রমশ ফুলে ওঠে, চোয়াল শক্ত হয়। ক্যামেরা একটু পিছিয়ে ওর মাথার ওপর একটা ছবিকে ধরে। মুঙ্খের দা ক্রাই, ক্যামেরা ক্রমশ ছবিটাকে জুম করতে থাকে। হঠাত একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা যায়, সবকিছু অন্ধকার হয়ে যায়।
ছবিটা মুছে গিয়ে অন্ধকার হয়ে যায়।

২৪ (৩ মিনিটের শট)
একটা মাঝারি মানের অফিসের রিসেপসান, বাবাইকে ঢুকতে দেখা যায়। একটু ইতস্তত করে, তারপর এগিয়ে যায় রিসেপসানের দিকে। রিসেপশনে একজন সুবেশা, চোখ না তুলেই বলে বলুন।
বাবাই – আমার একটা ইন্টারভিউএর জন্য কল এসেছিল।
রিসেপশনিস্ট – কিসের ইন্টারভিউ?
বাবাই – মানে... (বাবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। জল থেকে বার করা মাছের মত মনে হয়।)
রিসেপশনিস্ট – (এবার চোখ তুলে তাকায়, মুখে বিরক্তি, গলার স্বর যান্ত্রিক) কোন পোস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলেন?
বাবাই – আর্টিস্টের জন্য একটা...
রিসেপশনিস্ট – অ, কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে?
বাবাই – না তো
রিসেপশনিস্ট – কোন চিঠি আছে সঙ্গে?
বাবাই – না, আমি আপনাদের এখান থেকে একটা ফোন পেয়েছিলাম...
রিসেপশনিস্ট – এখান থেকে নয়, এজেন্সি থেকে। ঠিক আছে, আপনি ওদিকের সোফাতে গিয়ে বসুন, আর বায়োডাটাটা দিয়ে যান। (বাবাই ব্যাগ থেকে বায়োডাটা আর ওর কাজের বেশ কিছু ছবি বার করে দেয়।। রিসেপশানের মেয়েটি আবার বিরক্ত হয়) এসব আবার কি।
বাবাই – আমার কাজের...
রিসেপশনিস্ট – যেটা চেয়েছি শুধু সেটা দিন। (মেয়েটি ওর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে নেয়, বাবাই অনিচ্ছাসত্তেও ছবি গুলো ব্যাগে ভোরে রাখে।) এখন গিয়ে বসুন, সময় হলে ডাকা হবে।
বাবাই হতাশ পায়ে ধীরে ধীরে গিয়ে সোফার কোনে বসে। দেখা যায় ওর মত আরও কয়েকজন ওখানে বসে আছে। বাবাই চারপাশে তাকায়, রুচিবোধের কোন চিহ্ন অফিসটার কোথাও চোখে পড়েনা। রিসেপশানের পেছনে একটা ছবি লাগান। বাকি সবকিছুর মধ্যে এইছবিটাই বাবাইকে টানে। বাবাই অনেকক্ষণ ধরে ছবিটাকে দেখে।
(ছবিটা দেখার সময় বাঁশির একটা সুর শোনা যায়)
এরমধ্যে আরএকটি ছেলে আসে, রিসেপসানে দাঁড়ায়, বলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে। ডান দিকের দরজা দিয়ে তখনই ভেতরে চলে যায়। তারপর এইদিক থেকেও একজনকে ডাকা হয়।
ছেলেটি – কমার্শিয়াল আর্টিস্টের জন্য আমার ইন্টারভিউ ছিল।
রিসেপসানিস্ট – অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে?
ছেলেটি – হ্যাঁ, অভিক স্যার আমাকে ১টার সময় আসতে বলেছিলেন।
রিসেপসানিস্ট – ওকে, ডানদিক দিয়ে চলে যান। সামনে তিন নম্বর কেবিন অভিক স্যারের।
ছেলেটি – ওকে, থ্যাঙ্ক ইউ। (ছেলেটি ভেতরে ঢুকে যায়)
(ভেতর থেকে একজন বেরিয়ে আসে)
রিসেপসানিস্ট – বিপ্লব বাগচী...(বাবাই এর পাস থেকে একজন উঠে দাঁড়ায়) ভেতরে ঢুকে ডানদিকে দুনম্বর ঘর।

বাবাই উসখুস করতে থাকে। শেষে একজন রাশভারী চেহারার কোটটাই পরা লোক ডানদিকের দরজা ফাঁক করে বেরিয়ে আসে। রিসেপসানে নীচু গলায় কিছু কথা বলে।
বস - আর কতজন আছে।
রিসেপসানিস্ট – আর চার জন স্যর। (হাত তুলে বাবাইদের দিকে দেখিয়ে দেয়। আগের ছেলেটি হাসি হাসি মুখে বেরিয়ে আসে।)
বস - ঠিক আছে, পরপর পাঠিয়ে দাও।
আর একজন চৌখস চেহারার লোক বেরিয়ে আসে, বায়োডাটার কাগজ গুলো সংগ্রহ করে। একবার করে চোখ বুলিয়ে একএক জনকে ডাকতে থাকে।
ম্যানেজার – উমেশ যাদব। ওকে, আপনি স্টার মিডিয়া তে কাজ করেছেন... প্লিজ গো ইনসাইড, সেকেন্ড রুম ওন দ্যা রাইট।
ম্যানেজার – দেবব্রত বন্দোপাধ্যায়। আপনি... আপনার তো দেখছি স্কালপচার ছিল... আমাদের কাজটা কিন্তু মূলত কমার্শিয়াল, মিডিয়া আর অ্যাডভার্টাইজমেন্টএর ওপর। আপনার কোন প্রায়র এক্সপিরিয়েন্স আছে এই লাইনে। (বাবাই ঘাড় নেড়ে না বলে, চোয়াল শক্ত হয়) ... ঠিক আছে যান। ডানদিকে দ্বিতীয় ঘর। (লোকটা হালছাড়া গলায় বলে। বাবাই অনিচ্ছার সঙ্গে পা টেনে টেনে ভেতরে ঢুকে যায়।)
ক্যামেরা রিসেপশনের পেছনে রাখা ছবি আর তার ওপর টাঙানো ঘড়ির ওপর ফোকাস করে। ঘড়ির কাঁটা খুব দ্রুত ঘুরতে থাকে আর দেখা যায় ছবিটার থেকে রঙ ধুয়ে যাচ্ছে, ছবিটা যেন গলে গলে পড়ছে দেওয়াল থেকে। একটু পরে বাবাইকে দেখা যায় আবার দরজা ঠেলে বেরোতে। আরও হতাশ পায়ে অফিস ছেড়ে বেরিয়ে যায় বাবাই।
(বাঁশি আর বেহালায় সুরটা বাজতে থাকে, দ্রুত লয়ে)

২৫ (৫ মিনিটের শট)
বাবাই অফিসের কাঁচের দরজা খুলে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়। তখনই উল্টোদিকের দরজা ঠেলে আর একজন বেরিয়ে আসে। জিন্সের ওপর লম্বা পাঞ্জাবী, মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল, মাথার চুল উসকোখুস্কো। বাবাইএর সাজ পোশাকের সঙ্গে বিস্তর মিল রয়েছে। দুজনে দুজনকে দেখে অসম্ভব অবাক হয় এবং খুশিও।
বাবাই - অরূপদা, তুমি এখানে।
অরূপ - আরে আমি তো এখন এখানেই কাজ করি। কিন্তু তুই এখনে কি করছিস। (দুজনে দুজনের হাত জড়িয়ে ধরে)
বাবাই - এই একটা ইন্টারভিউ এর কল পেয়েছিলাম...
অরূপ - ও, কমার্শিয়াল আর্টিস্টের। কেমন হল?
বাবাই - হবে না... (কিছুক্ষণ চুপচাপ)
(বেহালার করুণ সুরটা আবার শোনা যায়)
অরূপ - চ নীচে যাই, আমি খেতেই নামছিলাম। আজ অফিসপাড়ার খাবার খেয়ে দেখ কেমন লাগে। (দুজনে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে। নাবতে নাবতে কথা হয়। ক্যামেরা ওপর থেকে ওদের নামা টাকে অনুসরণ করে) তোকে হঠাত করে দেখে খুব ভালো লাগছে, এখানে একেবারে হাঁপিয়ে উঠি। (সুরটা মিলিয়ে যায়)

দুজনে রাস্তায় নেমে আসে। মুহূর্তে অফিস পাড়ার ব্যাস্ত জনস্রোত ওদের গ্রাস করে। দুজনকে ভিড় ঠেলে এগোতে দেখা যায়। চারপাশে নতুন পুরনো নানা রকম পাঁচমিশেলি অফিস বাড়ির ভিড়। ফুটপাতে জনস্রোত, রাস্তায় গাড়ির ভিড়। তারই মধ্যে একজায়গায় রাস্তার ধারে কিছু খাবার যায়গা, অনেক মানুষের জটলা সেখানে। দুজনে এসে সেখানে একপাশে দাঁড়ায়, চাউমিন অর্ডার করে।
(অফিসপাড়ার ব্যাস্ততার শব্দ ওদের ঘিরে থাকে)
বাবাই - তুমি কবে চাকরিতে ঢুকলে? কলেজ ছাড়ার পর আর যোগাযোগই হয়নি তোমার সঙ্গে।
অরূপ - হল বেশ কিছুদিন, প্রায় একবছর হবে। (বিষণ্ণ গলায় বলে)
বাবাই - (বাবাই একটু ধন্দে পড়ে যায়) বা:, পুরো সেটেল হয়ে গেছ তা হলে বল...
অরূপ - না রে, একদমই নয়। (কিছুক্ষন চুপচাপ) তোর যে বললি ইন্টারভিউ ভালো হয়নি, আমি বলব সেটা আসলে ভালোই হয়েছে। (বাবাই অবাক হয়ে তাকায়। এর মধ্যে দোকনদার দুটো হাফপ্লেট চাউমিন দিয়ে যায়। ওরা খেতে থাকে।) এটা আমাদের যায়গা নয়।... ঠিক করেছি চাকরিটা ছেড়ে দেব।
বাবাই - (বাবাই চমকে ওঠে, খাওয়া থেমে যায়) সেকি, কেনো।
অরূপ - আমাদের অখিল স্যার বলতেন মনে আছে... তোমার সৃষ্টিতে বিশ্বের আনন্দ ধরা থাকে, সবসময় মনের আনন্দে কাজ করবে, আর কিছু ভাববেনা। (একটু নীরবতা) সেই আনন্দটাই হারিয়ে গেছে রে। আমি এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছি। (অরূপ ছটফট করে ওঠে) বিশ্বাস করবি লাস্ট একবছরে আমি একটাও কাজ করতে পারিনি। মানে কাজের মত কাজ...
বাবাই - কিন্তু চাকরি ছেড়ে দিলে তোমার চলবে কি করে।
অরূপ - ঠিক চলে যাবে। (ইশারায় নিজের হাত, চোখ আর বুকটা দেখায়) এই তিনটে জিনিস যতদিন ঠিক আছে আছে ততদিন সব ঠিক। (প্লেট নামিয়ে রাখে, হাত ধোয়) আর আমার তো কারুর জন্য ভাবার নেই, মা মারা গেছে প্রায় ছমাস হল।... আমি আবার আমার আগের জীবনে ফিরে যেতে চাই।

অরূপ দোকানদারকে পয়সা মিটিয়ে দেয়। বাবাই স্থানুর মত দাঁড়িয়ে থাকে। আস্ফুটে বলে
বাবাই - কাকীমা মারা গেছেন। আর শর্মিষ্ঠাদি...
অরূপ - জানিনা, বিয়ে করে নিয়েছে... তারপর আর কোন যোগাযোগ নেই। (দুজনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। একটা সিগারেট ধরায়, বাবাইকে দেয়।)
বাবাই - একটা কথা জিগেস করব। (অরূপ চোখ তুলে তাকায়) তোমাদের অফিসে রিসেপশনের পেছনে যে ছবিটা রয়েছে, ওটা কার।
অরূপ - কেন বল তো?
বাবাই - কিছু মনে করোনা, তোমাদের অফিসের সবকিছুর মধ্যে ওটা একটা ব্যাতিক্রম, সবকিছুর থেকে আলাদা।

অরূপ কিছুক্ষন সরু চোখে তাকিয়ে থাকে, সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে। মুখে একটা হালকা পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে। তারপর হাত বাড়িয়ে বাবাইএর পিঠ চাপড়ে দেয়।
অরূপ - শাবাস, চোখটা এখনো ঠিক আছে তা হলে। ঠিকই ধরেছিস, ওটা আমারই আঁকা। ওটাই বোধ হয় আমার শেষ ভালো কাজ। কলেজ পাস করার পরপরই আমরা অ্যাকাডেমিতে একটা একজিবিশান করেছিলাম। সেটার জন্যই করেছিলাম এই ছবিটা। সেখান থেকেই এরা কিনে নেয় এটা। সেই সুত্রেই যোগাযোগ, চাকরিটাও হয়ে যায়। চ... (দুজনে পা বাড়ায়, খাবার যায়গাটা ছাড়িয়ে অরূপ দাঁড়ায়) এবার তোকে আর একটা জিনিস দেখাই, ওই দেখ, সামনের বাড়িটার পাসে, ওই লাইটপোস্টটার গায়ে লাগান হোর্ডিটা দেখ। (অরূপ হাত তুলে সামনে একটা বিচ্ছিরি কটকটে রঙের পোস্টার দেখায়) এটা আমাদের করা, কাস্টমারের রিকয়েরমেন্ট অনুযায়ী।
(করুণ সুরটা আবার শোনা যায়)
বাবাই - তুমি এইসব করছো... (বাবাই অস্ফুটে বলে, স্বগতোক্তির মত)
অরূপ - তাহলে বুঝলি তো।... আজ চলিরে, যোগাযোগ রাখিস, আমাকে অফিসের নাম্বারে করলেই পাবি, যতদিন আছি ততদিন আর কি, তারপর জানিয়ে দেব।
গানের সুর (পাখোয়াজের সঙ্গে - সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে...)

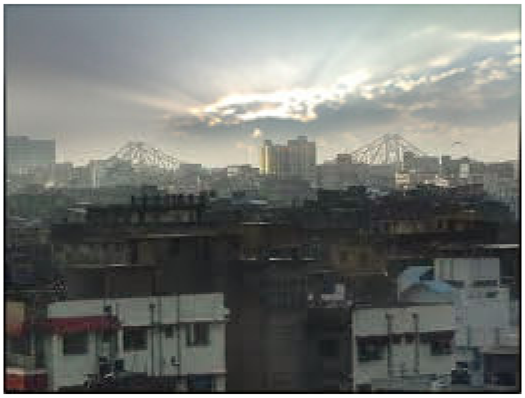

অরূপ চলে যায়, বাবাই তাকিয়ে থাকে খানিকক্ষন, তারপর অনির্দিষ্ট ভাবে হাঁটতে থাকে। ক্যামেরা শুধু পা দুটোকে ফলো করে। পেছনে পোস্টার কন্টকিত বিবর্ণ দেওয়াল। সামনে বিভিন্ন পেশার বিভিন্ন মানুষ ফুটপাতে বসে, হকার, মুটেমজুর, ভিখারী। তাদের সামনে দিয়ে অনেক পা নদীর স্রোতের মত বয়ে যেতে থাকে। ক্যামেরা বাবাইএর হেঁটে চলার সঙ্গে সঙ্গে প্যান করতে থাকে। একসময় সেখান থেকে জুম আউট করতে করতে ব্যস্ত অফিসপাড়ার একটা সামগ্রিক ছবি তুলে ধরে। পেছনে গানের সুর ছড়িয়ে পড়ে।
[জানোনা রে আধো উর্ধে, বাহির অন্তরে]
ক্যামেরা আরও ওয়াইড হয়ে সমস্ত সহর আর অনেকখানি আকাশকে ধরে। নীচে ঘোলাটে সহর, আকাশে ঘোলাটে মেঘের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়ে। ধীরে ধীরে মেঘের চারধারে একটা সোনালী আলোর রেখা ফুটে ওঠে।
(তোল আনত শির তেজরে ভয় ভারো... গানের সুর ধীরে মিলিয়ে যায়।)
ছবিটা ধীরে ধীরে মুছে যায়।

২৬ (২:৩০ মিনিটের শট)
বাবাই ফিরে আসে বাড়িতে।
ক্যামেরা বাবাইদের বাড়ির ভেতর থেকে দরজাকে ফোকাস করে। দরজার তালা খুলে বাবাই ঢোকে, হতাশ পায়ে। দরজার হুড়কো লাগিয়ে দেয়, তারপর হতাশ ভাবে দালানের সিঁড়ির ওপর বসে পড়ে। সামনে একটা ছোটো ঘরের মধ্যে অনেক ছবি, ছবি আঁকার সরঞ্জাম চোখে পড়ে, বাবাই কিছুক্ষণ একদৃষ্টে সেদিকে চেয়ে থাকে, তারপর উঠে গিয়ে সেগুলো ঘাঁটতে থাকে। অনেক পুরোন ছবি বার করে ছড়িয়ে ফেলে। এই সময় বাইরে থেকে কাগজ বিক্রিওয়ালার সুর শোনা যায়, হিন্দি টানে। হঠাত বাবাই দ্রুত পায়ে দরজা খুলে বাইরে আসে, কাগজ বিক্রিওয়ালাকে ডাকে। কাগজ বিক্রিওয়ালা দরজার সামনে তার জিনিসপত্র ছড়িয়ে বসে। বাবাই তার সামনে কিছুটা উদভ্রান্তের মত পুরোনো ছবির কাগজ এনে জড়ো করতে থাকে।
বাবাই - নাও ওজন করো, ওজন করো (কিছুটা রুক্ষ এবং অসহিষ্ণু গলার স্বর)
কাগজ বিক্রিওয়ালা ওজন করতে থাকে, কিছুটা আপন মনে নানা কথা বলে চলে।
কাগজওয়ালা – হাঁ বাবু দিজিয়ে।... ঠিক হ্যায় ঠিক হ্যায় ইধার রাখ দিজিয়ে।... সারা কাগজ... অর কুছ, ম্যাগজিন নেহি হ্যায় ক্যা...
বাবাই - কত হল সব মিলিয়ে।
কাগজওয়ালা - ইয়ে সব কাগজ মে...পাতা নেহি বাবু কিতনা মিলেগা।
বাবাই - বহুত মিলেগা..., ইয়ে সব আর্ট পেপার হ্যায়, হ্যাণ্ড মেড।

কাগজওয়ালা - কেয়া বাবু
বাবাই - আরে ইতনা মোটা মোটা কাগজ... ইয়ে তুমারা খবরের কাগজ নেহি। (বাবাই বাঙালি হিন্দি তে কথা বলে)
কাগজওয়ালা - ইয়ে সব চিজমে যাদা মিলতা নেহি বাবু।... মাগজিন নেহি হ্যায় বাবু, মাগজিন... উসমে যাদা মিলতা হ্যায় (ঝোলাথেকে কিছু সিনেমা আর বিদেশী অশ্লীল পত্রিকা বার করে।) আ্যায়সা ওয়ালা কুছ... (লোকটা দাঁত বার কোরে হাঁসে)
বাবাই - (বাবাই হঠাৎ করে রেগে ওঠে) যো দেনা হ্যায় দো, ওর নিকালো হিঁয়াসে...
কাগজওয়ালা - (লোকটা কিছু টাকা বাবাই এর হাতে গুঁজে দেয়) ইসসে যাদা নেহি মিলেগা বাবু। (লোকটা ওর ব্যাগপত্তর গুছিয়ে বেরিয়ে যায়)
(সেতারে একটা সুর বাজে, সন্ধ্যার রাগ)

বাবাই দড়াম করে বন্ধ করে দেয় দরজাটা। দরজার ওপর মাথা চেপে দাঁড়িয়ে থাকে বাবাই। লোকটা বেরিয়ে এদিক ওদিক চায়। আবার সুর করে ডাক দেয়। (ক্যামেরা দরজার মাথার ওপর সোজা নিচে ফোকাস করে বসানো, দরজার দুপাশই দেখা যায়। ক্যামেরা জুম আউট করে। দেখা যায় সামনের বাড়ির একতলার ছাদে একটি মেয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইশারায় কাগজওলাকে ডাকে।
ছবিটা মিলিয়ে যায়।

২৭ (১ মিনিটের শট)

ববিদের অফিস পাড়া। ক্যামেরা অফিসের সামনে থেকে গেটের দিকে ফোকাস করে। ববিকে গেট দিয়ে ল্যাপটপের ব্যাগ কাঁধে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়, কানে মোবাইল। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে সামনে আসে, মোবাইলে কথা বলতে বলতেই ববি গাড়িতে উঠে যায়, গাড়ি ছেড়ে দেয়। আরো কিছুক্ষন কথা বলে ফোন বন্ধ করে ববি।
ববি – ওকে ঠিক আছে। কালকে তাহলে আমার অফিসে পাঠিয়ে দেবেন।... না, না সেকেন্ড হাফে।... আরে দুটোর পর।... ছটার মধ্যে। ... হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি দেখে নেবো।... ৩০% তো...। আমি সিক্সথ ফ্লোরে বসি। হ্যাঁ রিসেপসনে বললেই হবে।
গাড়ি চলতে থাকে ট্রাফিক বাঁচিয়ে।
ববি – (স্বগোতোক্তি করে) ওয়ার্থলেস, এই সাড়ে ছটা বেজে গেলেই ট্রাফিকের যা হাল হয়।
ব্যাগ হাতড়ে একটা স্লিপ বার করে, ড্রাইভারকে দেয়।
ববি - আমাকে বাড়িতে পৌঁছে ল্যান্সডাউনের চশমার দোকানটার থেকে এই চশমাটা নিয়ে এসো। রেডি হয়ে গেছে, ওরা ফোন করেছিল। বুঝতে পেরেছোতো, সেদিন আমাকে যেখানে নিয়ে গিয়েছিলে।
ড্রাইভার ঘাড় নেড়ে কাগজটা নিয়ে নেয়। ববি আবার একটা নম্বর ডায়াল করতে থাকে। বাইরে অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসে। ক্যামেরা টপ শটে কলকাতার রাজপথকে ধরে, রাস্তায় অফিস ফেরত গাড়ির ভিড়।
(ব্যাস্ত রাস্তার মিশ্র শব্দ শোনা যায়)
ক্যামেরা অনেক উঁচু থেকে শহর কলকাতার আলোকিত রাজপথকে ধরে।

২৮ (১০ মিনিটের শট)
ক্যামেরা অনেক উঁচু থেকে আলোকিত রাজপথকে অনুসরন করে, গলির ভেতর বাবাই দের পাড়ায় চলে আসে।
সামনে থেকে পাড়ার মোড়ে চায়ের দোকানে ফোকাস করে। কিছু ছেলেকে জটলা করতে দেখা যায়। পাড়ার মোড়ের আড্ডা। ক্যামেরা মিড শটে পুরো আড্ডার মেজাজটাকে ধরে।
বন্ধু ১ – বা: আজকে সব জলদি জলদি।
বন্ধু ২ – আজ জমিয়ে ঠেক...
বন্ধু ১ – নে আজ জলদি ক্যারামটা নামা দেখি। কাল শালা ভালো করে খেলতেই পারিনি।
বন্ধু ২ – (ক্লাব ঘরের ভেতর ঢুকতে ঢুকতে) আয় তো, হাত লাগা...
সামনে ক্লাব ঘরের ভেতর থেকে ক্যারাম বোর্ড বার করে আনে একজন, তার ওপর লাইট ঝোলান হয়। ক্যামেরা ক্লোজ শটে লাইটের তারটাকে অনুসরন করে, দেখা যায় সেটা সামনের পোস্ট থেকে হুক করা। ক্যারাম খেলার তোড়জোড় চলতে থাকে। বাবাইকেও দেখা যায় খেলার যোগাড় করতে।
জয়ন্ত – কিরে, আজ তুই এত তাড়াতাড়ি। টিউশানি ছিল না।
বাবাই – ছিল... যাই নি, ভালোলাগছিল না, কাটিয়ে দিয়েছি।

জয়ন্ত - তা তো লাগবেই না, নিশ্চই কোনো ছেলেকে পড়ানোর ছিল। কি যেন... (পেছন থেকে একজন নামটা বলে দেয়) হ্যাঁ ওই সুপর্নার মত কোন মাল না হলে আর ভালো লাগবে কেন।
বাবাই - জয়ন্ত দা, ফালতু বলো না। ওসব কোন ব্যাপার না।
জয়ন্ত - তা তো বলবিই।
পাড়ার ছেলে - (আর একজন ফুট কাটে) তোর সুপর্নাকে দেখলাম রে সেদিন। এখন রোজ সকালে এদিক দিয়ে কোথায় একটা যায়।... কোথায় যায় রে?
বাবাই - (বাবাই ঝাঁঝিয়ে ওঠে) আমি কি করে জানব কোথায় যায়।
পাড়ার ছেলে - সে কি, তোর মাল তুই জানবি না। বাসে লেখা দেখিসনি, মাল নিজ দায়িত্বে রাখুন।
বাবাই - (বাবাই খেপে যায়। খেলার ছলে ছেলেটার ঘাড় চেপে ধরে) একেবারে টিপে মেরে ফেলবো...আমার কোন মাল ফাল নয়, বুঝলি।... শালা, আমাদের মত বেকার ছেলেদের জন্য নয় এসব।
জয়ন্ত - (জয়ন্ত দা, বাবাইএর পিঠ চাপড়ে দেয়) এইটা একটা লাখ কথার এক কথা বলেছিস। (এবার অন্য ছেলেটার দিকে ঘুরে বলে) বাসের ভেতরের লেখাটাই পড়েছ, আর বাসের পেছনে কি লেখা থাকে পড়নি... বল্লে হবে খরচা আছে... (সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। বাবাই সেই হাসিতে যোগ দেয়না, গুম হয়ে যায়।)
(কিবোর্ডে একটা হালকা সুর বাজে)

এইসব কথার মাঝেই হঠাৎ একটা চকচকে নতুন ফাঁকা অটো জোরে সামনের মোড়টা ঘুরে বেপরোয়া ভাবে ওদের সামনে এসে দাঁড়ায়। চালকের আসন থেকে একজন গাঁট্টা গোঁট্টা চেহারার গুণ্ডা টাইপের ছেলে লাফদিয়ে নামে।
জয়ন্ত - কিরে মন্টু এটা কবে নামালি।
মন্টু - (মন্টু, দুহাত ওপরে তুলে প্রায় নাচতে নাচতে এগিয়ে আসে) পরিবর্তন, পরিবর্তন
(সবাই মন্টুকে ঘিরে ধরে, নানা রকম বিস্ময় মিশ্রিত প্রশ্ন ভেসে আসতে থাকে)
বন্ধু ১ – আরে শালা গাড়ি নামিয়ে দিল।
বন্ধু ২ – কি করেছিস মাইরি।
বন্ধু ১ – একটু সিক্রেটটা তো বাতা দে।
(কিবোর্ডে একটা সুর, রহস্যময়তা তৈরী হয়)
মন্টু দোকানের বাইরে কাঠের বেঞ্চিতে বসে, সবাইকে ইশারায় কাছে ডেকে নেয়। সবাই ওর গা ঘেঁসে গোল করে ঘিরে দাঁড়ায়। শুধু বাবাই একটু তফাতে দাঁড়িয়ে থাকে। মন্টু চাপা হিসহিসে গলায় কথা বলে। (সুরটা মিলিয়ে যায়)
মন্টু - শালা, তিন বছর ধরে পাটি করছি কি এই করতে (একটা অশ্লীল ভঙ্গি করে)। অটোটা আমাদের পার্থদা কাউন্সিলারকে বলেটলে ব্যাবস্থা করে দিয়েছে। বলেছে পারমিটটাও বার করে দেবে। সামনের মাস থেকে দেখবি এই রুটেই নেমে যাব। (একটা সম্মিলিত তারিফের শব্দ ওঠে) দাদা গুরুদেব লোক মাইরি। (হাত জড়ো করে কপালে ঠেকায়। আবার একটা সম্মিলিত সমর্থন সূচক শব্দ ওঠে)
জয়ন্ত - তোর পার্থদাকে বলনা একবার, আমাদের ক্লাবঘরটার একটা ব্যবস্থা করে দিতে। আমরাও তো একটু আধটু লেবার দিই না কি... তাছাড়া পাড়ারও একটা ব্যাপার আছে, এইসব পুজোটুজো...
মন্টু - হয়ে যাবে, সব হয়ে যাবে। একবার যখন শুরু হয়েছে কোথাও আটকাবেনা। আমি অলরেডি দাদার সঙ্গে কথা বলেছি। দাদা বলেছে একদিন আসবে এখানে, কথা বলবে তোদের সঙ্গে। (আবার একটা সম্মিলিত তারিফের শব্দ ওঠে)
বাবাইকে দেখা যায় ক্যারাম বোর্ডের ওপর ঘুঁটি সাজিয়ে একাএকাই খেলতে। খুব জোরে একবার হিট করার শব্দ হয়। মন্টু চোখ তুলে তাকায়।
মন্টু - এই যে আটিস... আমার অটোটার পেছনে ডিজাইন করে একটু নামটা লিখে দিস গুরু।
বাবাই - (বাবাই হাসে) দেবো... কি নাম দিয়েছিস?
মন্টু - আমি আর কি বলবো, তোরাই বল।
বন্ধু ১ – নাম, পক্ষিরাজ কেমন হবে। পক্ষিরাজ ঘোড়া।
বন্ধু ২ – ঘোড়া,... তাহলে নাম দে ধান্লো... তোর বসন্তির ইজ্জত বাঁচিয়ে দেবে।
মন্টু – ফোট শালা...
বাবাই - নাম দে পার্থসারথি, তোর পার্থদাও খুশী হয়ে যাবে।
মন্টু - (মন্টু লাফিয়ে ওঠে) ঠিক বলেছিস, এই না হলে আটিস... ওইটাই লিখে দিস ভাইটি।
(কিবোর্ডের সুরটা আবার ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে)
এরমধ্যে আর একটা ছেলেকে গলির মোড় থেকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। লম্বা পেটানো চেহারা, জিন্স, টিশার্ট গুঁজে পরা, সবমিলিয়ে স্মার্ট এবং চতুর চেহারা।
জয়ন্ত - আরে তুষার না। (সকলে সমস্বরে হইহই করে ওঠে) কি ব্যাপার বল তো আজ, একেবারে চাঁদের হাট।

তুষার দূরথেকেই হাত নাড়ে। দ্রুত ওদের কাছে চলে আসে। তুষার মন্টু একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে। বাবাই ও এগিয়ে আসে, তুষার বাবাইকেও জড়িয়ে ধরে।
মন্টু – যা চেহারা বানিয়েছিস, সাহেব বাচ্চা একদম। কি করছিস আজ কাল।
তুষার - ভালোই আছিরে, তবে খুব টাফ লাইফ। কিছুদিন একটু কষ্টকরে কামিয়ে নিতে হবে আর কি।
বাবাই – করছিসটা কি?
তুষার - এখন আমি বি আর ও এতে আছি, আর্মির বর্ডার রোড। যারা রিমোট বর্ডার এরিয়ায়, পাহাড়ে রাস্তা বানায়। আমার পোস্টিং এখন কাশ্মীরে, শ্রীনগর কার্গীল সেক্টরে।
বাবাই – দারুণ তো, সেই জন্য এরকম লাল আপেলের মত চেহারা হয়েছে।
মন্টু – কিন্ত সেখানেতো শুনি সবসময় ফাইটিং, লাইফ রিস্ক শালা।
তুষার - নানা সেরকম কিছু নয়। মাঝে মাঝে এখনো ফায়ারিং হয় ঠিকই।... কিছু গুলিতো থরচা করতেই হয়, না হলে নতুন সাপ্লাই আসবে কি করে।... তখন আমরা সব বাঙ্কারের ভেতর সেল্টার নিই। (সমবেত ভাবে একটা বিস্ময় এবং তারিফ মেশানো শব্দ ওঠে) - এই গোবিন্দ (তুষার চাওলাকে উদ্দেশ্য করে বলে), সবার জন্য স্পেশাল চা। এটা আমি দিয়ে দিচ্ছি আলাদা করে।
গোবিন্দ চা দেয়, বাবাই আর তুষার একান্তে কথা বলতে থাকে।
বাবাই – কবে ফিরলি
তুষার - এই তো আজ সকালে। এবার দিন দশেক আছি।
বাবাই - তোর টাকাটা, আমার মনে আছে বুঝলি। এর মধ্যেই তোকে দিয়ে দেবো। সামনের মাসটা পড়ুক, টিউশানির টাকাগুলো পেয়ে যাব...
তুষার - ঠিক আছে ঠিক আছে, দিস অথন তোর সুবিধামতো।
বাবাই - খুব ভালোলাগছে তোর কথা শুনে। কি করে ঢুকলি এখানে।
তুষার - আরে তুই জানিস না আমার মামা আছে আর্মিতে। ভালো পোস্টে, দিল্লীতে কোয়ার্টার ফোয়াটার পায়। মামা তো বলেইছিল তুই সিভিলের ডিপ্লোমাটা একবার পাশ কর, তারপর আমি ঠিক একটা ব্যবস্থা করে দেব...
সবাই আবার হইহই করে কাছে চলে আসে।
মন্টু – আর একটু বল শুনি। এজীবনে তো আর আমাদের যাওয়া হবেনা ওসব জায়গায়।... এই...কাশ্মিরী মাল গুলো দারুণ না।
তুষার - দারুণ বলে দারুন, আর যখন তুই আর্মিতে জানবি জীবনে কোন কিছুর অভাব নেই। ম দিয়ে যাযা চাইবি সব পাবি। কোয়াটারে তো ছাড়, জানিস আমাদের বাঙ্কার গুলোর ভেতরে পর্যন্ত একেবারে ফাস্টক্লাস ব্যবস্থা থাকে। বাইরে চারিদিকে শুধু বরফ আর বরফ, একবার বাঙ্কারে ঢুকে পড়, একটাও গরম জামা গায়ে রাখতে পারবি না, ভেতরটা এত গরম।
জয়ন্ত – তাও, এরকম ভাবে দিনের পর দিন থাকা। আমাদের শালা পেছন দিয়ে হলুদ সুতো বেরিয়ে যাবে।
(কিবোর্ডে হালকা সুর, রহস্যময়তা তৈরী করে)
তুষার - তা ঠিক, লাইফটা একটু টাফ হয়ে যায়... আমার তো টার্গেট পাঁচ সাত বছর কোনরকমে টেনে দেওয়া। তাহলেই যা মাল জমবে তা দিয়ে ফিরে এসে অ্যাস করব।
জয়ন্ত – দুর গান্ডু, পাঁচ বছরের রোজগার দিয়ে সারা জীবন খাবি?
মন্টু – আর শালা ওই পাহাড় পর্বতের রাজ্যে তো কোন ডান দিক বাঁ দিক করারও যায়গা নেই।
তুষার - কে বলেছে তোকে। কোন ধারনা নেই তোদের। ওখানে কি হয় আর কি হয়না, এখানে বসে তোরা চিন্তাও করতে পারবিনা।... (সুরটা মিলিয়ে যায়) একটা ছোট্টো একজাম্পেল দিচ্ছি... আমাদের কনস্ট্রাকশনের একএকটা ট্রাক বা ডাম্পার যখন মাল তুলতে ওপর থেকে নীচে নামে নিয়ম হচ্ছে সবাই ফুল ট্যাঙ্ক করে নেয় আমাদের নিজেদের স্টেশন থেকে। নীচে নেমে বাঁধা কয়েকটা পাম্প আছে, সেখানে বাকি ট্যাঙ্ক খালি করে দেওয়া হয়, তার একটা বাঁধা রেট আছে। তারপর আবার ক্যানটনমেন্টর স্টেশানে রিফিলিং হয়। এই তেল গুলো আবার কাটা তেল হিসাবে অন্য সরকারি গাড়িতে ভরা হয়, আসলে কম রেটে, কিন্ত দেখান হয় না। সেটা ড্রাইভারদের সঙ্গে সেটিং থাকে। (সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনে, মন্টুর মুখ হাঁ হয়ে যায়। বাবাই একই ভাবে বেঞ্চিতে বসে অপলকে চেয়ে থাকে। ক্রমশ চোয়াল শক্ত হয়)। এরকম ভাবে একএকটা ট্রিপে অন্তত চার পাঁচ হাজার টাকার ডিলিং হয়। এবার ভাব সারাদিনে এরকম কতগুলো গাড়ি কতবার ট্রিপ করে। (তুষার বিজ্ঞের মত হাসে)
মন্টু – ওরেব্বাবা
জয়ন্ত দা – এইবারে বুঝলাম... কাশ্মিরকে কেন ভুস্বর্গ বলে। একমাত্র স্বর্গেই এরকম হওয়া সম্ভব।
তুষার - তবে ভাবিসনা এই টাকাটা শুধু ওই ড্রাইভার আর হেল্পারের পকেটে যায়। এর একটা পুরো চেন আছে, আলাদা করে এর হিসেব রাখা হয়। সবাই এর ভাগ পায়, সবাই, এমনকি দিল্লীতে হেড অফিস পর্যন্ত।
বাবাই – তোরাও পাস... (সুরটা ফিরে আসে)
তুষার - অবশ্যই... (কথাটা বলেই তুষার বাবাই এর দিকে ঘোরে, বাবাই স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তুষার বলতে গিয়ে একটু হোঁচট খায়, তারপর আবার শুরু করে একটু বেশী জোর দিয়ে) ...তোকে নিতেই হবে, এটা একটা সিস্টেম বুঝলি, এরমধ্যে একবার গিয়ে পড়লে তুই আর অন্য কিছু করতে পারবিনা।... যেখানে মাঝেমাঝেই গুলি চলে, চারিদিকে বরফের পাহাড় আর খাদ... একদিন তুই হঠাৎ হারিয়ে যাবি, মিসিং, বুঝলি... এরকম আগেও হয়েছে। (সুরটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়)
গল্পের সুরটাও কেটে যায়। ভিড়টা একটু ছড়িয়ে পড়ে। কয়েকজন ক্যারামের কাছে ভিড় জমায়।
মন্টু – তুই চলে যাবার পর থেকে আমাদের মেহফিলটাও একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে রে।
তুষার - হয়ে যাক তবে আজগেই। জয়ন্ত দা চলো, বাবাই, যাবি নাকি...

জয়ন্ত – আজগেই... চল তবে, শুভকাজে দেরি না করাই উচিত
বাবাই – নারে, আমার আজকে হবেনা ।
তিনজন যাওয়ার জন্য পা বাড়ায়। বাবাই ইশারায় ডাকে তুষারকে, তুষার এগিয়ে যায়। ওদের পেছন দিয়ে বেঞ্চের কোনে আর একটি লোককে অস্পষ্ট দেখা যায় ঠোঙা থেকে মুড়ি খেতে।
বাবাই - শোন, তোর টাকাটা (বাবাই পকেট থেকে টাকা বার করে) দেখলাম আমার কাছে এখন আছে। দিয়েই দিই, পরে আবার কখন দেখা হয় না হয়।
তুষার - আরে ঠিক আছে... (বাবাই ওর হাতে টাকাটা গুঁজে দেয়) যা: শালা (স্বগতোক্তি করে, মন্টু তাড়া দেয়, তিন জন নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে চলে যায়। বাবাই স্থানুর মত দাঁড়িয়ে থাকে। ক্যামেরা একই যায়গা থেকে ওদের চলে যাওয়াটা ধরে। তার পর ধীরে ধীরে বেঞ্চে বসা লোকটাকে ফোকাস করে।)
বেঞ্চে বসা লোকটিকে এবার পরিস্কার দেখা যায়। মাথায় কাঁচা পাকা চুল, মুখে কাঁচাপাকে দাড়িগোঁফের জঙ্গল। সরু মুখ, রোগা শরীর। শুধু চোখ দুটো অসম্ভব উজ্জ্বল। বাবাই কে ইশারায় ডাকে। বাবাই হাসে, পাশে গিয়ে বসে।
জ্যোতর্ময় দা - কি, মাসের শেষে পকেট এত গরম? ছবিটবি বিক্রি হল নাকি।
(সেতারে একটা সুর বাজে)
হ্যাঁ জ্যোতর্ময়দা সব ছবি বিক্রি করে দিয়েছি। (লোকটি অবাক হয়ে তাকায়। বাবাই মাথা নামিয়ে কথা বলে।) কাগজওলাকে... কি হবে জমিয়ে রেখে, মাঝখানথেকে উই ধরছিল, সব নষ্ট হয়ে যেত (কিছুক্ষন সবাই চুপচাপ। লোকটি বাবাই এর কাঁধে হাত রাখে।)
জ্যোতর্ময় দা - কেন বিক্রি করলে জিগ্গেস করিনি তো, তার থেকে বরং কয়েকটা লাইন শোনাই, উইএর কথাই যখন বললে। (কাঁধের ঝোলা থেকে হাতড়ে একটা লম্বাটে খাতা বার করে আনে) শোনো। “ছন্নছাড়া কবিদের ফাইলে উইপোকা লাগেনা। তাদের কবিতাগুলি হাভাতে খোকার মত ঘুরে বেড়ায়, এবং অন্ধ সময়কে হাত ধরে রাস্তাপার করে দেয়।” ... কবি আর শিল্পীরা একই গোষ্ঠির, তাই তাদের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে।
(সুরটা ধীরে মিলিয়ে যায়)
বাবাই - (বাবাইএর চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়) অসাধারণ! এটা কি আপনার নতুন কবিতার লাইন।
জ্যোতর্ময় দা - এরকম কত লাইন আসে আবার হারিয়ে যায়, এগুলো সেইরকমই কিছু হারিয়ে যাওয়া লাইন। (কিছুক্ষন সবাই চুপচাপ, চা নেয়, বাবাইকেও দেয়)। বাবাই তুমি তো জানো, আমি লোকটা দেখতে যেমন কাঠ কাঠ, রুক্ষ, কথাবর্তাও সেই রকম। অনাবশ্যক প্রশংসা, পিঠচাপড়ানো এসব আমার ধাতে নেই।...তোমার কবিতার খাতাটা আমি পড়েছি, খুঁটিয়ে, খুঁটিয়ে, প্রতিটি লাইন। আমার মনে হয়েছে এর মধ্যে অসাধারণ সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে।... এখন শুধু কিছুটা অনুশীলন দরকার।... আমার কথাগুলো গুরুত্ব দিয়ে ভেবো, আর আমার দিক থেকে যতটুকু সাহায্য প্রয়োজন তার থেকে বেশীই তুমি পাবে। এই সম্ভাবনাটাকে নষ্ট করে ফেলোনা।
বাবাই - (বাবাই হাতদুটো জড়িয়ে ধরে) থ্যাঙ্ক ইউ জ্যোতর্ময়দা, আমি চেষ্টা করে যাব।
জ্যোতর্ময় দা - আর দেখো, কি হয়নি, কি পাইনি, অন্যরা কি করে ফেলল, সোজা পথে না বাঁকা পথে! এসব নিয়ে যদি তুমি ভাবতেই থাকো তো অনন্তকাল তাই ভাবতে থাকবে। এ এক ভীষণ আবর্ত, একসময় তুমিও তার মধ্য তলিয়ে যাবে।... এই আমাকেই দেখো, আই ওয়াজ ইউনিভার্সিটি গোল্ডমেডেলিস্ট। আমার সেইসময়ের বন্ধুবান্ধবেরা আজ সব বিরাট বিরাট যায়গায় বসে আছে। বাট আই হ্যাব চোজেন দিস পাথ, নিজের ইচ্ছায়, আর তার জন্য আমার এতটুকু আপশোস নেই। স্কুলে পড়াই, কবিতা লিখি, আমার মত আরও কয়েকজন মিলে একটা ছোটো পত্রিকা চালাই। আমার জীবনে কোনো অভাববোধ নেই, নিজের কাজ নিয়ে দিব্বি আছি।... তুমিও তোমার লক্ষ স্থির কর আর তাতে অবিচল থাকো। ... কাল তোমাকে একটা যায়গায় নিয়ে যাব। আমরা যারা লিটিল ম্যাগাজিন করনেওয়ালা আমাদের বছরে একটা মেলা হয়, নন্দন চত্বরে। আমাদের মত আরও অনেক মানুষকে সেখানে দেখতে পাবে, আলাপ হবে। চিন্তার বিকাশের জন্য এক্সচেঞ্জ অফ আইডিয়া খুব জরুরি। দেখো তোমার ভালো লাগবে। চারটের মধ্যে এখানে চলে এসো, আমরা একসঙ্গেই যাব।
বাবাই - আমি চলে আসব জ্যোতির্ময় দা।
(সেতারের সুরটা আবার শোনা যায়)
ক্যামেরা জুম আউট করতে থাকে। দুজনকে বেঞ্চে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলতে দেখা যায়। ক্যামেরা আরও জুম আউট করে বৃহত্তর শহরকে ধরে। রাতের কলকাতা, রাস্তায় গাড়ির ভিড়। স্ট্রিট লাইটের পাশে পূর্ণিমার গোল চাঁদ উঠতে দেখা যায়। সামনে একটা গাছের পাতাভরা ডাল ঝুঁকে পড়েছে। হঠাৎ করে নাগরিক রাতটাকে বড়ো মায়াবী লাগে।
ক্যামেরা আবার টপশটে বৃহত্তর কলকাতার নাগরিক জীবনের চলমান ছবিটাকে ধরে।

২৯ (২ মিনিটের শট)
শহর কলকাতার সামগ্রিক ছবি থেকে ক্যামেরা আবার ফোকাস করে ববিদের অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের জানলায়।
(পাশ্চাত্য সংগীতের একটা হালকা সুর বাজে, কিছুটা রহস্যময়তা তৈরী হয়)
দেখা যায় ববিকে তার ঘরে ল্যাপটপে কাজ করতে। সামনে একটা খাপে ভরা চশমা রাখা, নীচে ক্যাশমেমো। ববি খাপ থেকে চশমাটা বার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। চোখে পরে। সঙ্গে সঙ্গে ছবিটা কিছুটা ধুসর হয়ে যায়। আবার খুলে ফেলে, ছবিটা আবার আগের মত হয়ে যায়। ববি আবার চশমাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, মুখ দেখে মনে হয়না খুশি হতে পেরেছে। মা দরজায় এসে দাঁড়ায়। চশমাটা দেখিয়ে বলে।
(সুরটা মিলিয়ে যায়)
মা - রমাপদ দিয়ে গেল, বলল তুই নাকি আনতে দিয়েছিলি... আমি রেখে দিয়েছিলাম তোর টেবিলে।

ববি - হ্যাঁ, কিন্তু কিছু একটা গন্ডোগোল করেছে মনে হচ্ছে। চোখে পরলে আলোটা কেমন কম মনে হচ্ছে।
মা - কাল তাহলে একবার চেক করিয়ে নিস, পাওয়ার টাওয়ার আবার বাড়লো কি না। দিন রাত তো কম্পিউটারের দিকে তাকিয়েই বসে থাকিস।
ববি - না পাওয়ার তো মনে হচ্ছে ঠিকই আছে, দেখি দুদিন একটু পরে। না হলে তারপর একবার চেক করিয়ে নেব।
(সুরটা আবার শোনা যায়)
মা ছেলের বিছানা ঠিক করে দেয়, জামা গুছিয়ে রাখে আলমারিতে। ববি চশমাটা পরে থাকে।
মা - কিরে আজও রাত জেগে কাজ করবি।
ববি - হ্যাঁ, কিছু কাজ আছে। তোমরা শুয়ে পড়ো।
মা - বেশী রাত জাগিসনি বাবা। কাল তো সকাল বেলা আবার অফিস আছে।

মা চলে যায়। ক্যামেরা ববির ল্যাপটপের স্ক্রিনে ফোকাস করে, দেখা যায় সেখানে ফেসবুক খোলা। ববির ফ্রেন্ডলিস্টে বেশ কিছু মেয়ের ছবি চোখে পড়ে। কয়েক জনের সঙ্গে ববিকে চ্যাট করতে দেখা যায়। ইউএস থেকে একজন এবং একটি মেয়ের সঙ্গে একসঙ্গে চ্যাট চলতে থাকে।)

- Any onsite position for long term?
Sabby – No new onsite position, business is not growing.
Any internal rotation?
I am desperately looking.
(message: user is going offline)

ববি - শিট (ববি হতাশ হয়ে টেবিলে ঘুঁসি মারে)
Indrani – you never tell that to me before
Please try to understand me.
Indrani – I have understood
Indrani – you are a perfect hypocrite

ববি - ও শিট (ববি হতাশ হয়ে দুহাতে মাথা চেপে ধরে)
(সুরটা দ্রুত লয়ে বাজতে থাকে)
হঠাৎ করে কম্পিউটারের স্ক্রিন জুড়ে নো নিউ অনসাইট পজিসান আর ইউ আর অ্যা পারফেক্ট হিপোক্রিট এই লাইন দুটো নাচানাচি করতে থাকে। ক্রমশ তারা সারা ঘরের দেওয়াল জুড়ে ঘুরে বেড়ায়। ববি উদভ্রান্তের মত চারিদিকে তাকাতে থাকে। একসময় অধৈর্য ভাবে চোখ থেকে চশমাটা খুলে ফেলে। ঘরের সমস্ত আলো দপ করে নিভে যায়। অন্ধকারের ভেতর থেকে ববির গলা একবার শুধু শোনা যায়।
(সুরটাও হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়)
ববি – ও শিট, পাওয়ার কাট।

৩০ (২:৩০ মিনিটের শট)
(সেতারের ঝঙ্কার, মধ্যরাতের রাগ শোনা যায়)
ক্যামেরা বাবাইদের ছাদের ঘরে ফোকাস করে। বাবাইকে দেখা যায় টেবিলে বসে কিছু একটা লিখতে, একমনে। পাসে একটা টেবিল ল্যাম্প। বোন এসে দরজায় দাঁড়ায়, হাতে ধরা একটা চশমার বাক্স।
বোন - কিরে কি করছিস, লিখছিস... অনেকদিন পর আবার তোকে লিখতে দেখলাম।... কালকে দেখাস।
বাবাই - ঠিক আছে, এখন তোরা শুয়ে পড়।
বোন - একটা জিনিস তোকে দেখাতে এলাম। (বাবাই মুখ তোলে) সকালে ঘরটা পরিস্কার করতে করতে এটা পেলাম। (বাবাই চশমার বাক্সটা হাতে নিয়ে দেখে, অবাক হয়) বাবাকে কোনদিন এই রকম চশমা পরতে দেখেছিস।
বাবাই - না তো।... হয়ত শেষদিকে করিয়েছিল, আমরা জানতাম না।
বোন - চশমার বাক্সটা একটা খামের ভেতর ছিল, আর সেটা বাবা যেখানে তোর সব কাগজপত্র, সার্টিফিকেট গুছিয়ে রাখত তার সঙ্গে রাখা ছিল।
বাবাই - তাই (বাবাই আরও অবাক হয়) আশ্চর্য, কই দেখি। (হাত বাড়িয়ে চশমার বাক্সটা নেয়, চশমাটা বার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে।) কোন পাওয়ার আছে বলে তো মনে হচ্ছেনা। (বাবাই চশমাটা চোখে পরে। ছবিটা সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল মনে হয়। খুলে আবার পরে। ছবিটা আবার উজ্জ্বল হয়।) - বা: বেশ ভালো তো। সবকিছু বেশ পরিস্কার লাগছে। পাওয়ার হল নাকি চোখে?
বোন – (মুখটিপে হাসে) পরে থাক, ভালো লাগছে। বেশ আঁতেল আঁতেল মনে হচ্ছে।
বাবাই - যা ভাগ...
(সেতারের সুর মিলিয়ে গিয়ে একটা গানের সুর ক্রমশ স্পষ্ট হয়। (আমার একটি কথা, বাঁশি জানে)
বাবাই আবার লেখায় মন দেয়। ক্যামেরা বাবাইএর লেখার ওপর ফোকাস করে। কয়েকটা লাইন পড়া যায়।

"সুচেতনা, তোমাকে দিলাম আমার বায়ডাটার একটা কপি। পুলিনের চায়ের দোকানে কেটলিতে জল ফোটে। পাঞ্জাবি গায়ে বাঁশের বেঞ্চিতে বসে থাকি, সস্তা সিগারেট ঠোঁটে। সিগারেট ফোটে আমার চিন্তায়। ইচ্ছাকরে লক্ষ্মীপেঁচাকে কষে লাথি মারি।..."

বাবাই লেখে। ক্যামেরা ধীরে ধীরে জুম আউট করে, টপশটে পুরো পাড়াটাকে ধরে। নিঝুম রাত, কুকুর দুটোকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দেখা যায়। শুধু বাবাইদের আর সামনের বাড়ির ছাদের ঘরে আলো দেখা যায়। বাড়িঘর আর গাছপালার ফাঁকদিয়ে আকাশের চাঁদটা দেখা যায়। সামনের বাড়ির ছাদের ঘরের একফালি আলো বার হয়ে ছাদের ওপর পড়েছে। সেই অস্পস্ট আলোতে একটি মেয়েকে ছাদে পায়চারি করতে দেখা যায়, মনে হয় আকাশের দিকে তাকিয়ে।
(রাতের আকাশ ভরিয়ে দিয়ে গানের সুর ছড়িয়ে পড়ে)
ক্যামেরা আবার বাবাইএর ঘরে ফিরে আসে। বাবাইকে এখন একটুকরো কাগজে কিছু স্কেচ করতে দেখা যায়। জানলা দিয়ে বাইরে ছাদের অংশবিশেষ চোখে পড়ে, মেয়েটিকে একই ভাবে পায়চারি করতে দেখা যায়। একসময় বাবাই খাতা কাগজ গুটিয়ে উঠে পড়ে। চশমাটা খুলে হাতে নেয়। ঘরের আলো নিভিয়ে জানলায় এসে দাঁড়ায়। সামনের ছাদের ঘরের আলোও নিভে যায়। (গান ক্রমশ মিলিয়ে যায়)

৩১ (:১০ মিনিটের শট)
পরের শটে বাবাইকে বিছানায় ঘুমিয়ে থাকতে দেখা যায়। পাশের টুলের ওপর চশমাটা খোলা। পুরো অন্ধকার ঘরের মধ্যে চশমাটা যেন নিজের আলোতে উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

বিরতি
(থিম পোস্টারের ওপর লেখাটা ফুটে ওঠে)

৩২ (৩:৩০ মিনিটের শট)
বাবাই দের বাড়ির ভেতর, অন্ধকারের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে ছবিটা ফুটে ওঠে।
(সন্তুরে একটা হালকা সুর বাজে)
একটা উজ্জ্বল সকাল, ঝকঝকে রোদ। বাবাইকে উঠে মুখধুতে দেখা যায়।
বোন – অনেক দিন পরে আজ সকালে সুন্দর রোদ উঠেছে। না হলে রোজ সকালে কুয়াসা আর কুয়াসা, ভালো লাগেনা।
মা – হ্যাঁ, দেখবি আজ রাতে কিরকম ঠান্ডা পড়বে।
মুখধুয়ে ঘরে ঢুকে গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে আসে, চোখে সেই চশমা। মা দুজনকে খেতে ডাকে। দুজনে রান্নাঘরের দাওয়ায় এসে বসে। একফালি রোদ এসে পড়ে দুজনের মুখে।
মা – এই তোরা আয়, খেতে দিচ্ছি।
বোন – দাদা আয়।
বোন – মা দেখেছো সেই চশমাটা পরে দাদাকে কেমন অন্যরকম লাগছে।
মা – (মা কিছু বলেনা, মুখ নামিয়ে একটু হাসে।) আসলে একদম ওর বাবার মত লাগছে। তোদের মনে থাকবেনা, বয়সকালে তোদের বাবাকে ঠিক এরকমই লাগতো।
বোন – হ্যাঁ ঠিক বলেছো। বাবার আগের ছবিগুলোতে ঠিক এরকমই লাগত।
বাবাই – যা, বাজে বকিসনা। আমি খুলে রাখছি।
বোন – না, না খুলিস না প্লিজ, সত্যি বলছি ভালো লাগছে। আচ্ছা বাবা আর কিছু বলছিনা।
(সুরটা ধীরে মিলিয়ে যায়। বোন উঠে পড়ে বেরোনের জন্য।)
বোন – আমি বেরোচ্ছি, আজ কলেজে স্পেশাল ক্লাস আছে। [যাবার সময় বাবাই এর মাথার চুল গুলো ঘেঁটে দেয়] – একদম আমাদের কফিহাউসের আঁতেল লাগছে।
বাবাই ছদ্ম রাগ দেখায়। মা মুখটিপে হাসে। বোন রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মা কাজ করতে করতে কথা বলে।
মা – কাল তুই আমার ওপর মিছিমিছি রাগ করছিলি… আমি কি তোকে বুঝিনা? অন্য পথে চললে অনেককিছু করা যায় আমিও জানি, কিন্তু তুইতো সেই পথ বাছিসনি। তুই তোর বাবার পথে চলছিস। আর আমরা সবাই সেটাই চাই… আমি কিছুই বলিনি, তোর মেসোমশাই ই বলছিল তোকে কার সঙ্গে যেন দেখা করতে। আমি শুধু বলেছি যে ওকে বলে দেখবো, তবে ওর ওইসবে মন নেই, নিজের কাজ নিয়েই দিনরাত মেতে আছে।
বাবাই – ভালো করেছো। আমার ওইসব ভালোলাগেনা।
মা – আমি জানি বাবা… তুই নিজের চেষ্টাতেই নিজের পায়ে দাঁড়াবি। কারুর সাহায্য লাগবেনা। ভগবান একদিন ঠিকই মুখ তুলে চাইবে আমাদের দিকে।
বাবাই – ভগবান তো ওপরে, মুখ তুলে চাইলে আরও ওপরে আর কি দেখতে পাবে। মুখ নামিয়ে দেখলে তবেনা দেখতে পাবে।
বোন – (দেখা যায় কলেজে বেরোনের জন্য তৈরী। পেছনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে) সেই জন্যই তো আজ অবদি দেখতে পেলোনা। (দুজনে হেসে ওঠে)
মা – যা:, তোদের সবেতেই ইয়ার্কি, ওরকম বলতে নেই।
বাবাই কিছু বলতে যায়, এমন সময় দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হয় জোরে। পিওনের ডাক শোনা যায়।
পিওন - চিঠি আছে
(কিবোর্ডে একটা সুর বাজে, রহস্যময়তা ঘনিয়ে তোলে)
বোন দ্রুত যায় দরজাতে। ক্যামেরা ফলো করে পেছন থেকে।
বোন – দাদা, তোর চিঠি, এসে দেখতো, রেজিস্ট্রি চিঠি (গলার স্বরে চাপা উত্তেজনা। বাবাই দ্রুত উঠে যায়)
(সুর মিলিয়ে যায়)
বাবাই পিওনের থেকে সই করে চিঠিটা নেয়। লম্বা সাদা খাম, একটা স্কুলের ছাপ মারা। বাবাই এর হাত কাঁপে, তার পেছনে পিওনের চলে যাওয়া অস্পষ্ট দেখা যায়)
বোন – কিসের চিঠিরে দাদা… (আর কৌতুহল ধরে রাখতে পারেনা)
বাবাই – কি করে জানবো (গলার স্বর কেঁপে যায়)
বোন – দেখ না, দেখ না, খোল… মনে হচ্ছে…
উত্তেজনায় বোন চুপ করে যায়, মা বার হয়ে এসে দাঁড়ায় রান্নাঘরের দরজায়। বাবাই একবার বোকার মত চারদিকে তাকায়, সবাই ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। বাবাই ধীরে ধীরে খামের মুখটা খোলে, সাদা কাগজের চিঠিটা বার করে আনে, একবার চোখ বোলায়। তারপর আনন্দে দুহাত আকাশে ছুঁড়ে দেয়।
বাবাই – (সবাই অপলকে ওর দিকে তাকিয়ে) হয়ে গেছে, স্কুলের ইন্টারভিউটা… আরে যেটা দিয়েছিলাম আগের মাসে সেটার প্যানেলে নাম উঠেছে। পরের সপ্তাহে ডেট দিয়েছে দেখা করার।
বোন লাফিয়ে ওঠে, বাবাই কে জড়িয়ে ধরে। মা আনন্দে কেঁদে ফেলে।
মা – (উত্তেজিত হয়ে পড়ে) দেখ, দেখ আমি বলেছিলাম না ভগবান ঠিকই একদিন চাইবে…
বোন – সত্যি, তুমি ঠিকই বলেছিলে।… এর থেকে ভালো কিছু আর হতে পারেনা।… এই দাদা, স্কুলে যাবার আগে একটু পরিস্কার টরিস্কার হয়ে মানুষের মত চেহারা করিস। না হলে স্কুলের ছেলেরা একটা পাগল ভেবে হয়ত ঢুকতেই দেবে না।
বাবাই – চল ভাগ, স্কুলে যেতে এখন ঢের দেরি আছে। সামনের সপ্তাহে দেখা করতে বলেছে, তারপর জয়নিং ডেট দেবে।

বোন – সে যাই হোক, আমার কিন্ত গিফ্ট চাই। এখন কিছু বলছি না, কিন্তু প্রথম মাইনে পাওয়ার পর একদম সুদে আসলে উসুল করে নেবো।
বাবাই – ঠিক আছে, ঠিক আছে, সে সব তোকে ভাবতে হবেনা।
বোন – এই কি দিবি রে, বল না, বল না...
বাবাই – তোর কি চাই তো বল...
বোন – আমার,...দাঁড়া, ভেবে চিন্তে বলছি। সহজে ছাড়বোনা কিন্তু।
মা - আমাকে পরে একটা রান্নার গ্যাস করিয়ে দিস বাবা। এই উনুন নিয়ে আজকাল বড়ো সমস্যা।
(সন্তুরের সুরটা ফিরে আসে)
... একটা খুশির হাওয়া বইতে থাকে। একসময় বোন বেরিয়ে যায়, বাবাই ঘরে গিয়ে বিছানার পাসের টেবিলের ড্রয়ারে চিঠিটা যত্ন করে ভরে রাখে। তারপর বেরোনোর জন্য তৈরী হতে থাকে। বেরনোর আগে বাবাই হঠাৎ মার সামনে গিয়ে মাকে প্রণাম করে, মা ওর মাথা ধরে আশীর্বাদ করে।
মা – আমি জানতাম একটা কাজ তোর ঠিকই হয়ে যাবে, সেটা খুব বড়ো কথা নয়। আসল কথা হল মানুষের মত মানুষ হওয়া। এই কথাটাই সব সময় মনে রাখবি।
(সন্তুরের সঙ্গে সেতারের ঝঙ্কার মেশে)
বাবাই বেরিয়ে যায়, তার আগে দরজার পাশে রাখা নির্মীয়মান স্কালপচারটার গায়ের থেকে ধুলো ঝাড়ে, নারী মূর্তির মুখটাকে একটু ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে পরম যত্নে।
ছবিটা মিলিয়ে যায়।

৩৩ (৩:৩০ মিনিটের শট)
ববির অফিসের ভেতর।
অফিস আজ প্রায় নিস্তব্ধ, সবাইকে নিজের নিজের ডেস্কে বসে কাজ করতে দেখা যায়। বাবিকে দেখা যায় মন দিয়ে একটা ইমেল লিখতে। চোখে চশমা, একবার খুলে কাঁচটা পরিস্কার করে আবার চোখে পরে। পাশের ডেস্ক থেকে একজন উঠে আসে
সহকর্মী – কফি...
ববি – হ্যাঁ চল... (দুজনে উঠে যায় অফিসের প্যান্ট্রির সামনে, ক্যামেরা ফলো করে। দুজনে অটোমেটিক ডিসপেন্সিং মেসিন থেকে দুকাপ কফি নেয়।)
সহকর্মী – কি বলছিল তখন অর্ঘ্যদা...
ববি – দূর, আবার কি, সেই এক কথা... বোগাস...
সহকর্মী – তুমি কি বললে?
ববি – কি আবার বলব, আমি বলে দিয়েছি আমার পক্ষে সম্ভব নয়।... পাগল না কি, সব ছেড়েছুড়ে চেন্নাইতে গিয়ে পড়ে থাকবো। অফ অল প্লেসেস চেন্নাই!! ইজ ইট অ্যা হ্যাবিটেবিল প্লেস? অ্যাবসোলিউটলি আউট অফ কোশ্চেন।... (কফিতে চুমুক দিতে থাকে) আর বাইরে যদি যেতেই হয়, তাহলে আউট অফ কান্ট্রি যাব, হোয়াই শুড ইট বি চেন্নাই?
সহকর্মী – কিন্ত, এবার ওরা খুব ডেসপারেট মনে হচ্ছে। কিছু একটা বড়ো এসক্যালেসান হয়েছে।
ববি – তোমাকেও বলেছে বুঝি।
সহকর্মী – হ্যাঁ তো... কাল রাতেই আমাকে ধরেছিল।
ববি – কি বললে?
সহকর্মী – কি আর বলবো, আমিও অনেক আপত্তি করছিলাম, কোন পাত্তাই দিলনা। অনেক বলে শেষ পর্যন্ত তিন মাসে রাজি করিয়েছি।
ববি – আই ডোন্ট কেয়ার, অ্যাবসোলিউটলি... তাছাড়া এই মূহুর্তে আমার কিছু পারসোনাল কমিটমেন্ট আছে। ... চলো
দুজনে কফি শেষ করে আবার ডেস্কে ফিরে আসে। দেখা যায় ববির ডেস্কের সামনে একজনকে দাঁড়িয়ে ব্যস্তভাবে এদিক ওদিক তাকাতে।
(কিবোর্ডে একটা সুর রহস্যময়তা তৈরী করে)
অর্ঘ্য – আরে, কোথায় ছিলে, আই ওয়াজ কলিং ইওর এক্সটেনসন ফর সামটাইম। (ববি জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়) ডিজি ওয়াজ লুকিং ফর ইউ।
ববি – লুকিং ফর মি? (স্বরে কিছুটা ভয় ধরা পড়ে)
অর্ঘ্য – ইয়া..য়া.., কাম, কাম, হি ইজ ইন হিজ কেবিন।
অর্ঘ্য পা বাড়ায়, ববি ভয়ে ভয়ে অনুসরন করে। একবার পেছন ফিরে তাকায়। দেখা যায় আগের দিনের নীল শার্ট পরা ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়েছে, মুখে কৌতুক মেশানো হাসি। চোখাচোখি হতেই দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে নেয় ববি, চোয়াল শক্ত হয়।
ডিজির কেবিন, অর্ঘ্য, ববি কাঁচের দরজার বাইরে টোকা দেয়। ক্যামেরা ডিজি সাহেবের পেছন থেকে বাবিদের দিকে ফোকাস করে।
ডিজি – কাম ইন (দুজনে ভেতরে ঢোকে, ববি একটু জড়সড় হয়ে দাঁড়ায়, অর্ঘ্য গিয়ে পাশের একটা চেয়ারে বসে।
কিছুক্ষন বসে থাকে। ডিজি স্যার ফোনে কথা বলে। ফোন শেষ করে ববিদের দিকে ফেরে।
ইয়েস, উই উইল ডু ইট।... ডোন্ট ওয়ারি, আই অ্যাম গিভিং ইউ দ্যা অ্যাসিওরেন্স।... নো নো, টেল মি হোয়াট অ্যাসিওরেন্স ইউ নিড।... লিভ দ্যাট টু মি।... ওকে ফাইন, আই উইল আস্ক দেম টু কিপ ইউ আপডেটেড এভরি ডে।... ওকে, থ্যাঙ্কস, বাই।
(ফোন নামিয়ে ওদের দিকে ফেরে)
... ইয়েস ববি... ওকে... লুক, ইউ নো, উই গট অ্যা নিউ অ্যাকাউন্ট।...

ববি – ইয়েস স্যার।
ডিজি – এটা আমাদের কাছে একটা বিরাট অপারচুনিটি। ইট হ্যজ অ্যা স্টেডি প্রোজেক্সন অফ থ্রি ইয়ারস। তোমাদের ইনিশিয়ালি এটার ট্রানজিশান নিতে হবে, ফ্রম দ্যা এক্সিজিসটিং ভেন্ডর। তারপর এই অ্যাকাউন্টটা আমরা এখান থেকেই অপরেট করবো।... এনি ইসু...
ববি – না মানে, আমার এখন বাইরে যেতে একটু প্রবলেম ছিল।
ডিজি – হোয়াট কাইন্ড অফ প্রবলেম? মে আই নো দ্যাট?
ববি – না মানে বাড়িতে...
ডিজি – কিন্তু অর্ঘ যে আমাকে বলল, তুমি নাকি ধরে ওকে বলেছ যে তুমি ওনসাইট অ্যাসাইনমেন্ট চাও। ইজ ইট নট ট্রু অর্ঘ।
ববি – ইয়েস স্যার, আই অ্যাম রিয়ালি ইনটারেস্টেড ফর অনসাইট
ডিজি – তবে যে তুমি বললে যে বাড়িতে প্রবলেম আছে। এটা কিরকম প্রবলেম যাতে দেশের বাইরে যাওয়া যায়, কিন্ত দেশের মধ্যে এক যায়গা থেকে অন্য যায়গায় যাওয়া যায় না।
ববি – নো স্যার, একচুয়ালি, চেন্নাই ইজ বিট এক্সট্রিম...
ডিজি – হোয়াট ননসেন্স... এক্সট্রিম আবার কি। আর উই ডুইং সাম কাইন্ড অফ চ্যারিটি হিয়ার। এটা কি একটা সফটওয়ার ফার্ম নাকি একটা ট্যুর অপরেটারের অফিস, যে আমরা লোকজনকে ধরে ধরে শুধু একজটিক লোকেশানে পাঠাব।... দ্যা কারেন্ট ভেন্ডার ইস ফ্রম চেন্নাই, উই হ্যাবটু গো দেয়ার এন্ড টেক দ্যা ট্রানজিশান। দ্যাটস ইট... (অর্ঘকে দেখা যায় মুখ লুকিয়ে হাসতে)
...দিস ইজ দ্যা টাইম টু ওয়ার্ক হার্ড অ্যান্ড লার্ন ববি। তুমি এখন যাও তিন চার মাসের জন্য, কাম ব্যাক এন্ড দেন গো ফর অ্যা লঙটার্ম অনসাইট অ্যাসাইনমেন্ট। আমি অর্ঘ্যকে বলে দিয়েছি, হি উইল ফাইন্ড আউট সামথিং ফর ইউ বাই দিস টাইম। উই হ্যাব লট অফ অপারচুনিটিজ ইন ইউএস, ইউকে।...
ববি – বাট স্যার, একচুয়ালি মাই ম্যারেজ হ্যাজবিন ফাইনালাইজড...
ডিজি – দ্যটস গ্রেট, নো প্রবলেম অ্যাটঅল, ডু ইট ইন বিটুইন। অর্ঘ্য, তুমি ওকে ওই সময় পাঁচদিন ছুটি দিয়ে দিও।
ববি – স্যার, আমি পনেরো দিনের ছুটি অ্যাপ্লাই করে দিয়েছিলাম...
ডিজি – (হো, হো করে হেসে ওঠে, ববি বোকার মত তাকিয়ে থাকে) এভরিথিং ইজ সো আনসারটেন ইন দিস ওয়ার্ল্ড, ইউ নো। এই অর্ঘ্যকেই দেখ না, আস্ক হিম, কতদিনের ছুটি ও পেয়েছিল। অর্ঘ্য, হোয়াই ডোন্ট ইউ টেল ইওর স্টোরি টু হিম।
অর্ঘ্য – ফর মি ইট ওয়াজ রিয়ালি এক্সট্রিম, বিকজ অফ দ্যাট প্রোডাকসন ইসু আই হ্যাডটু কাম অন দ্যা ডে বিফোর, অ্যাজ ওয়েল অন দ্যা ভেরি নেক্সট ডে। আই ডোন্ট থিঙ্ক ববি ইজ গেটিং ইনটু দ্যাটস কাইন্ড অফ সিচুয়েসন।
ডিজি – তাহলে শুনলে তো।... ওকে, ইউ মে গো নাউ।
ববি মাথা নিচু করে বেরিয়ে যায়।
ডিজি – (অর্ঘকে বলে) এটা আমাদের ক্রেডেবিলিটির প্রশ্ন। আনটিল উই কুড পুটআপ এ ডিসেন্ট টিম কুইকলি, উই ওন্টবি গেটিং দ্যা অ্যাকাউন্ট হিয়ার।... এন্ড আই কান্ট রিস্ক ইট বিকজ অফ দিজ ফুলস...
টক টু ইওর সোনালি মোনালি, হুএভার, অ্যারেঞ্জ দ্যা টিকিটস এন্ড মেকদেম ফ্লাই বাই টুমরো। টিম মাস্টবি দেয়ার বাই ডেআফটার টুমরো মরনিং।
ছবিটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে পরের দৃশ্য ভেসে ওঠে।

৩৪ (৩ মিনিটের শট)
বাবাই দের পাড়ার দোকান।
(সেতার আর সন্তুরে একটা হালকা রাগ বাজে, কথা শুরু হলে মিলিয়ে যায়)
বাবাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাড়ার দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। পরিস্কার ঝকঝকে রোদ, নীল আকাশ, একটা সুন্দর শীতের সকাল। বাবাই দোকানের বেঞ্চে বসে, সকালের কাগজের পাতা ওলটায়। কাগজে সামনের পাতায় সচীনের মস্ত ছবি, সঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার জয়ের খবর। গোবিন্দ নিজের থেকে এসে বড়ো ভাঁড়ে চা দিয়ে যায়।
চাওয়ালা – নাও বাবাইদা, স্পেশাল চা।
বাবাই – (অবাক হয়ে তাকায়) কি ব্যাপার বলো তো গোবিন্দদা (গোবিন্দ কিছু বলেনা শুধু দাঁত বারকরে হাসে। বাবাই ধীরে ধীরে চায়ে চুমুক দেয়, চোখমুখে একটা তৃপ্তির ছাপ পড়ে।) – তোমার বাকির টাকাটা সামনের মাসে পুরোটা মিটিয়ে দেব, বুঝলে গোবিন্দদা।
চাওয়ালা – আর কি বাকি। কাল রাতে তোমাদের ওই বন্ধু গো, যে বাইরে থাকে, কাল এসছিল। তোমার টাকাটা দিয়ে গেল। বলল তুমি নাকি কি ওকে ভুল করে বেশী টাকা দিয়ে দিয়েছো।... আমাকে জিগেস করল কত বাকি আছে, আমি বললাম... তা বলল ওকে আর দিয়ে কি হবে, তোমাকেই দিয়ে যাই, পরে ওকে বলে দেব।... তা তোমার সঙ্গে কথা হয়নি?
(সাসপেন্সের সুর)
বাবাই – (খুবই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে) কে তুষার? তুষার দিয়ে গেছে। কই কিছু বলেনি তো। (বাবাই অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে থাকে)
চাওয়ালা – নতুন চশমা বানালে নাকি বাবাইদা, বা: বেশ মানিয়েছেতো...
(সাসপেন্সের সুরটা মিলিয়ে গিয়ে সন্তুরের হালকা সুরটা ফিরে আসে)
বাবাই শুনতে পায়না, অন্যমনস্ক ভাবেই বসে থাকে, হাতে কাগজ ধরা। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সকালের রোদ এসে পড়ে একটা অদ্ভুত আলোআঁধারি তৈরী করে। শীতের হাওয়ায় সামনের গাছ থেকে অনেক পাতা ঝরে পড়ে, বাবাই এর পায়ের নীচেও ঝরা পাতার চাদর। হাওয়ায় ঝরা পাতাগুলো একধার থেকে অন্য ধারে উড়ে যায়। ক্যামেরা বাবাইএর পেছন থেকে সামনের গাছের ওপর ফোকাস

করে, ওপর থেকে অনেক পাতা ঝরে পড়তে দেখা যায়। ক্যামেরা ধীরে ধীরে গাছের গুঁড়ির গায়ে ফোকাস করে, দেখা যায় একটা ছোট্টো ডালে কয়েকটা সদ্য গজান সবুজ পাতা।
সামনের বাড়ির থেকে সেই শুভ্রকেশ ভদ্রলোক গাড়ি বার করেন, আজ একা। দরজা লাগিয়ে গাড়িতে ওঠার সময় বাবাইকে দেখতে পান।
ভদ্রলোক – আরে বাবাই, শোন শোন, তোমাকেই খুঁজছি, কথা আছে। (ইসারায় বাবাইকে কাছে ডাকে, বাবাই কাগজটা ভাঁজ করে রেখে দ্রুত এগিয়ে যায়।) – শোনো... আমার চেনা একজন, তোমাদের লাইনেই আছে, তার সঙ্গে একজিবিশান টেকজিবিশন অ্যারেঞ্জ করে বিভিন্ন যায়গায়। তো এবার ওরা ঠিক করেছে বোম্বের জাহাঙ্গিরে একটা একজিবিশন করবে, এই ফেব্রুয়ারী, মার্চে, বেঙ্গলের বার্ডিং আর্টিস্ট আর স্কাল্পটারদের নিয়ে। খুব ভালো ইনিসিয়েটিভ, আমি ওদের খুব অ্যাপ্রেসিয়েট করেছি।... তো তোমার কাজের যে ছবিগুলো আমাকে দেখতে দিয়েছিলে সেগুলো আমি ওকে দেখিয়েছিলাম। ওতো খুব একসাইটেড, বলেছে এইরকম কাজই ওদের চাই, একদম অরিজিনাল। তুমি যদি রাজি থাক তো ও একদিন আসবে আমার কাছে, তোমার কাজ দেখবে। যেগুলো পছন্দ হবে, সেগুলো ওরা নিয়ে যাবে।... হয়ত জাহাঙ্গিরের পরে আরও দুএকটা জায়গায় ওরা একজিবিশনটা নিয়ে যাবে।... কি ভাবছ, রাজি থাকলে আমাকে বল?
বাবাই – (স্থানুর মত দাঁড়িয়ে থাকে, চোখ মুখ চকচক করে ওঠে) দাদা, আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেব জানিনা। এটা আমার কাছে একটা স্বপ্নের মত। (বাবাই ভদ্রলোকের দুই হাত জড়িয়ে ধরে)। আপনি যখন ভালো বুঝবেন ওনাকে বলবেন, আমি তো বাড়িতেই থাকি।
ভদ্রলোক – ঠিক আছে, তুমি রাজি তো তাহলে। দেখো ভদ্রলোকের সঙ্গে কমিশনের ব্যাপার টা নিয়ে আগে কথা বলে নিও।
বাবাই – ওসব নিয়ে আমি এখন ভাবতেই পারছি না...
ভদ্রলোক – না, না, ভাবতে হবে। আগেই একটা এগ্রিমেন্ট করে নেবে, না হলে পরে খুব সমস্যা হয়।
বাবাই – যেরকম আপনি বলবেন দাদা।
ভদ্রলোক – ঠিক আছে... (বাবাই কে খানিকক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে) তোমাকে কেমন যেন অন্যরকম লাগছে।... ও হো আচ্ছা আচ্ছা, চশমা লাগিয়েছ দেখছি একটা আমার মত। পাওয়ার হল নাকি তোমার?
বাবাই – (লজ্জা পেয়ে হাসে) না, না, এমনি।
ভদ্রলোক – ভালো ভালো, স্মার্ট লাগছে।... (বাবাই এর পিঠ চাপড়ে দেয়) নাও এবার ভালো করে কাজ কর, ইটস অ্যা রোড ওপনার ফর ইউ। চলি তাহলে, কাল একবার সকালে দেখা করো।
ভদ্রলোক গাড়িতে উঠে চলে যায়, বাবাই আকাশের দিকে তাকায়, চোখ মুখ খুশীতে চকচক করে। হাত দিয়ে মাথার চুল ঠিক করে, ধীরে ধীরে হাঁটা লাগায় গলির মোড়ের দিকে।
(সেতার আর সন্তুরে একটা খুশির সুর সমস্ত আকাশ বাতাস জুড়ে বাজতে থাকে)
ছবিটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে পরের দৃশ্য ভেসে ওঠে।

৩৫ (২ মিনিটের শট)
বাবাইদের পাড়ার মোড়ের বাস স্টপ, আগের ছবির ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে ভেসে ওঠে।
(গাড়ি, রাস্তার আওয়াজের পেছন থেকে খুশির সুরটা এখনো শোনা যায়)
বাবাই কিছুটা উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটতে হাঁটতে বড়ো রাস্তার মোড়ে পৌঁছায়। সামনে বাস রাস্তা, জানযট, অফিস টাইমের ব্যাস্ততা। বাবাই রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে, চারিধার দিয়ে স্রোতের মত মানুষ আর গাড়ি বয়ে যেতে থাকে। ক্যামেরা কিছুটা ওপর থকে পুরো জায়গাটাকে ধরে, ছবিটাকে একটু দ্রুত চালান হয়।
হঠাৎ পেছন থেকে একটি মেয়ে উচ্ছল ভাবে ছুটে এসে বাবাই এর হাত দুটো ধরে ঝাঁকিয়ে দেয়।
(সুরটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়)
সুপর্না – বাবাইদা, কি করছ এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।
বাবাই – (চমকে ওঠে, সেই সঙ্গে কিছুটা সংকুচিত, কিন্তু চোখমুখে স্পষ্ট খুশীর ছাপ) আরে, সুপর্না তুমি... এখানে।
সুপর্না – কেন, আসতে নেই নাকি, তোমার পাড়ায়।
বাবাই – না, না মানে...
সুপর্না – তোমার তো আর দেখাই মেলেনা, ভুলেই গেছো আমাদের। তাই আমাকেই আসতে হল... (সুপর্না মুখ টিপে হাসতে থাকে, চোখে কৌতুক)
বাবাই – না, না, ভুলে যাব কেন। আসলে পাঁচ রকম কাজে...। মাসিমা ভালো আছেন?
সুপর্না – হ্যাঁ মা ভালো আছে। ...তোমাকে বলা হয়নি, আমাদের ইন্সটিটিউট থেকে এখন ইন্ডাস্ট্রি প্রোজেক্টের জন্য এখানে একটা কম্পানিতে আমাদের ছমাসের পোস্টিং দিয়েছে। এখানেই গড়িয়াহাটের মোড়ের কাছেই আমাদের অফিসটা। এই কয়েকদিন হল শুরু হয়েছে।
বাবাই – বাঃ, খুব ভালো।
সুপর্না – আজ আমার কোন কাজ ছিলনা, শুধু একটা ফাইল দেবার ছিল।... জান কি আশ্চর্য, এখান দিয়ে যেতে যেতে তোমার কথাই ভাবছিলাম। আমার মনে আছে, তুমি বলেছিলে তোমার বাড়ি এখানে।... একদিন...
বাবাই – হ্যাঁ তো, এই তো এই গলিটা দিয়ে ঢুকে ডানদিকে গেলেই...
সুপর্না – একদিনও তো নিয়ে গেলেনা, কতবার বলেছি তোমার ছবি দেখবো।
বাবাই – (লজ্জা পেয়ে যায়) আরে না না... চল না আজই চল, যদি তোমার সময় থাকে।
সুপর্না – না গো, আজ থাক, আর একদিন যাব।
বাবাই – তোমাকে একটা ভালো খবর দেওয়ার ছিল, তোমাদের বাড়িই যাব বলে ভাবছিলাম।

সুপর্ণা – বাজে কথা বলো না, তোমাকে আমি জানিনা... যাই হোক কি খবর শুনি।
বাবাই – সুপর্ণা, আমার স্কুলের চাকরিটা হয়ে গেছে, আজগেই সকালে চিঠিটা এসেছে...
সুপর্ণা – হোয়াট!! (সুপর্ণা লাফিয়ে ওঠে, বাবাইএর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে লাফাতে থাকে) দারুণ খবর, দারুণ খবর বাবাইদা। ট্রিট চাই, ট্রিট চাই, আমি কিচ্ছু শুনতে চাইনা। (সুপর্ণাকে উচ্ছল ঝর্নার মত মনে হয়)
... এই দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না, আর পরে ফরেও আমি শুনছি না। আমার এখুনি ট্রিট চাই... তারপর পরে যা হবে দেখা যাবে।... চলো... (সুপর্ণা বাবাইকে হাত ধরে টানতে থাকে)

৩৬ (১:৩০ মিনিটের শট)
বাবাই মোড়ের দোকান থেকে দুটো এগরোল কেনে। তারপর সুপর্ণা দুটো আইসক্রিম কেনে। পেছনে কোথাও একটা মাইকে একটা চলতি সিনেমার গান বাজতে থাকে, তুমি আমি, ভালোবাসা এইসব নিয়ে, সুরটা মিষ্টি।
সুপর্ণা – চল, কোথাও গিয়ে একটু বসি। লেকের এদিকটায় অনেকদিন আসা হয়নি।
দুজনে লেকের বেঞ্চিতে গিয়ে বসে। ক্যামেরা পেছন থেকে ওদের ঘনিষ্ঠ ভাবে বসাটাকে ধরে।
সুপর্ণা – জানো তো, বাড়িতে না বিয়ের জন্য আবার চাপাচাপি শুরু করেছে। বিশেষ করে মা...। আমি একদম না করে রেখেছি... তবু জানি তলায় তলায় একে ওকে বলা কওয়া সমানে চলছে।

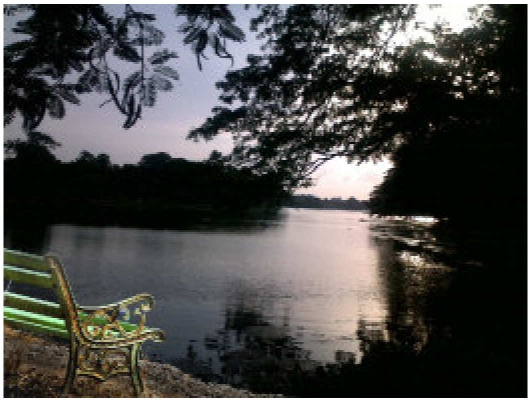

বাবাই – না করেই বা রেখেছো কেনো। একজন সুদর্শন, উচ্চ শিক্ষিত, চাকুরিজীবি, কোনরকম দাবিদাওয়া বিহীন ব্রাহ্মণ পাত্র দেখে বিয়েটা করে নিলেই তো পার।
সুপর্ণা – সবসময় ইয়ার্কি মেরোনা তো বাবাই দা।... আমার এসব একদম ভালো লাগে না।
বাবাই – তোমার ঠিক কিরকম ভালো লাগে সুপর্ণা।
সুপর্ণা – (মাথা নিচু করে) আমি জানি না...

সামনে বিস্তৃত লেকের জল, ওপরে নীল আকাশে দুএক টুকরো সাদা মেঘ। গাছের তলায় আলোআঁধারির খেলা। দূরে কোথাও মাইকে গানটা বাজতে থাকে। ক্রমশ ক্যামেরা জুমআউট করে চারপাশের প্রকৃতিকে ধরে, তার মাঝে এককোনে লেকের বেঞ্চিতে দুজন বসে থাকে। সূর্যের একফালি আলো গাছের ফাঁকদিয়ে ওদের ওপর এসে পড়ে।
ছবিটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়।

৩৭ (২ মিনিটের শট)
বাবিকে অফিসের সামনে দেখা যায়, ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে। হতাশ দৃষ্টি, শরীরটা সামনে একটু ঝুকে গেছে। ফোন করে ড্রাইভারকে ডাকে। কয়েকটা কাক এসে সামনের চায়ের দোকানটার চালে বসে, বিশ্রি কর্কশ স্বরে কা কা করে ডাকতে থাকে। বাবাই একবার মুখ ঘুরিয়ে দেখে, হাত তোলে তাড়ানোর জন্য।
এরমধ্যেই গাড়িটা চলে আসে, ববিকে নিয়ে চলে যায়। ববিকে দেখা যায় পেছনের সিটে শরীর এলিয়ে বসে থাকতে চোখ বোজা। হঠাৎ ড্রাইভার – সামনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে মনে হচ্ছে। একটা বাইক ধাক্কা খেয়েছে মনে হচ্ছে।
ববি – (একবার উঁকি মেরে দেখে) যা হয়েছে, হয়েছে... বেরিয়ে চলো তাড়াতাড়ি, আবার রাস্তাফাস্তা বন্ধ করে দিলে ঝামেলার একশেষ হবে।
ড্রাইভার – (মুখ বার করে দেখার চেষ্টা করে, গাড়ির গতিও একটু ধীর হয়) ইস একেবারে থেঁতলে গেছে। বাঁচবে কিনা কে জানে।
ববি – (অধৈর্য হয়ে ওঠে) তোমাকে বলছি বেরিয়ে চলো, কিচ্ছু দেখার দরকার নেই।
ক্যামেরা এবার ভিড়টার কাছে চলে আসে। অনেক লোককে উত্তেজিত ভাবে কথা বলতে দেখা যায়।
ভিড় ১ – শালা গাড়িটা মেরে বেরিয়ে গেল, চোখের সামনে।
ভিড় ২ – থামাতে পারলি না।
ভিড় ৩ – আরে আমরা ছিলাম রাস্তার ওই দিকে। ছুটে আসতে আসতেই বেরিয়ে গেল।
ভিড় ১ – কিন্ত এটার যা অবস্থা হয়েছে, এ শালা বাঁচবে কিনা কে জানে।
ভিড় ২ – এখুনি হসপিটালে নিয়ে যেতে পারলে হয়ত হয়। বাবলা দা ফোন করল বোধ হয় অ্যাম্বুলেন্স না পুলিস কাকে যেন।
দূর থেকে ববি দের গাড়িটাকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়।
ভিড় ১ – এই এই, একটা গাড়ি আসছে...
ভিড় ২ - দাঁড় করা দাঁড় করা...
ভিড় ৩ - এটাতে করেই তাহলে হসপিটালে নিয়ে চল, তাড়াতাড়ি করতে হবে।
একদল লোক ববিদের গাড়িটা থামানোর চেষ্টা করে।
সমবেত – এই দাঁড়াও, আরে থাম, থাম...
ভিড় ১ – এই শালা পালাতে চেষ্টা করছে...

গাড়িটা একবার পাশকাটিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করে। উত্তেজিত জনতা লাঠি, বাঁশ হতে তেড়ে যায়, গাড়িটাকে ধরে ফেলে। গালিগালাজ চলতে থাকে।
ভিড় ২ – দে, দে শালাকে, একটা বাড়ি লাগা। থামবেনা মানে, ওর বাপ থামবে।
ভিড় ৩ – এই তোল তোল। পেছনের সিটে শুইয়ে দে।
কিছু লোক বাইক আরোহীকে ধরাধরি করে তোলার চেষ্টা করে। এমন সময় হুটার বাজিয়ে একটা অ্যাম্বুলেন্সকে আসতে দেখা যায়।
ভিড় – এই এসে গেছেরে, অ্যাম্বুলেন্স এসে গেছে।... তুলে দে তুলে দে, তাহলে এটাতেই তুলে দে।... ছেড়ে দে ওটাকে ছেড়ে দে।
অ্যাম্বুলেন্সটা এসে দাঁড়ায়, দ্রুত স্ট্রেচার নিয়ে দুটো লোক নেমে পড়ে। কিছু লোক ভিড়ের মধ্যে ববিদের গাড়িটাকে পথ করে দেয়, গাড়িটা বেরিয়ে যায়।
ববিকে দেখা যায় পেছনের সিটে বিধ্বস্ত হয়ে বসে থাকতে।
ববি – ওঃ হরিবল এক্সপিরিয়েন্স... (স্বগতোক্তি করে) রক্ত আমি একদম টলারেট করতে পারিনা।
ছবিটা ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

৩৮ (১:৩০ মিনিটের শট)

বইমেলা চত্তরে লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়নের আলো ঝলমলে মঞ্চ, সারি সারি ম্যাগাজিনের স্টল। বহু মানুষের ভিড়। এক ধারে বাবাই, জ্যোতির্ময় দা, একজন শুভ্রকেশ বৃদ্ধ ভদ্রলোক এবং আরও কয়েকজনকে কথা বলতে দেখা যায়। জ্যোতির্ময় দা বাবাইএর পরিচয় করিয়ে দেন।
জ্যোতির্ময় – দাদা, পরিচয় করিয়ে দিই। (বাবাই কে দেখিয়ে) এর লেখাই সেদিন আপনাকে দেখিয়েছিলাম। আর আজও তো শুনলেন।
বৃদ্ধ ভদ্রলোক – (বাবাইএর পিঠ চাপড়ে দেয়) তোমার কবিতা শুনলাম, খুব ভালো। জ্যোতির্ময়... বুঝলে, এর মধ্যে বারুদ আছে। (চা ওয়ালাকে ডেকে লেবু চা নেয় সবার জন্য)...
এই দাও তো, লেবু চা। সবাই কে দাও। (সবাই চা নেয়, চা খেতে খেতে বাবাইএর সঙ্গে কথা হয়) মাথাটা পরিস্কার রেখো, কারো কাছে বিক্রি করে দিও না... আর চোখ কান খোলা রেখো। ...আর সবচেয়ে বড়ো কথা, চর্চাটা ছেড়োনা।... এই নাও, এটা পড়ে দেখো। (কাঁধের ঝোলা থেকে একটা ম্যাগাজিন বার করে দেয়) এটা আমাদের মেলা সংখ্যা। আর আমাদের পরের সংখ্যার জন্য তোমাকে এখন থেকে বলে রাখলাম, ভুলে যেওনা কিন্তু।
বাবাই - (বাবাই ঘাড় নাড়ে, একটু কুন্ঠিত ভাব) না না, অবশ্যই। কিন্তু আমার কবিতা কি ছাপার মত...
বৃদ্ধ ভদ্রলোক – সে বিচার তো আমি করব।... তুমি লেখাগুলো জ্যোতির্ময় কে দিয়ে দিও, তাহলেই আমি পেয়ে যাব।
ক্যামেরা ধীরে ধীরে জুম আউট করে সমস্ত নন্দন চত্তরটাকে ধরে, তারপর একটা আলোকিত রাজপথকে।

৩৯ (১ মিনিটের শট)
ক্যামেরা আলোকিত রাজপথকে অনুসরণ করে বাবাই দের গলির মুখ এবং শেষে পাড়ার চায়ের দোকানে এসে পৌঁছায়। জ্যোতির্ময় দা আর বাবাই কে আসতে দেখা যায়।
জ্যোতির্ময় দা – চলি তাহলে।
বাবাই – অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, দারুন কাটল আজগের দিনটা। (হাতদুটো ধরে)
জ্যোতির্ময় দা – কি, বলেছিলাম না, ভালো লাগবে। (বাবাই ঘাড় নাড়ে)
জ্যোতির্ময় দা চলে যায়। বাবাই ধীরে ধীরে ওদের ঠেকের সামনে এসে দাঁড়ায়, এদিক ওদিক তাকায়। আজ কাউকে চোখে পড়েনা, একেবারে ফাঁকা। এইসময় দুটো বাইকে তিনটে ছেলে এসে দাঁড়ায়।
ছেলেরা – আরে বাবাই, নিবারণ জ্যেঠুর হঠাৎ করে খুব বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। জয়ন্তদারা এখুনি হসপিটালে নিয়ে গেল।
বাবাই – সেকি, দুদিন আগেই তো দেখা হল, তখন তো...
ছেলেরা – হ্যাঁ, হঠাৎ করেই। বলছিল আজ রাতেই অপরেশন করতে হতে পারে, ব্লাড লাগবে।
বাবাই – হ্যাঁ হ্যাঁ, চল চল...
বাবাই একটা বাইকের পেছনে ওঠে, দুটো বাইক জোরে বেরিয়ে যায়।

৪০ (৩০ সেকেণ্ডের শট)
বাবাই আর কয়েকটি ছেলে কে একটা হাসপাতালের সামনে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়, সঙ্গে একজন প্রৌঢ় ভদ্রমহিলা।
ভদ্রমহিলা – তোমরা ছিলে বলেই যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা হল।

বাবাই – আপনি কোন চিন্তা করবেন না মাসিমা, আমরা সবাই তো আছি। এরা রাতে এখানেই আছে, যদি কোন দরকার লাগে। চলুন আপনাকে আমি বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।
মন্টু তার নতুন অটোটা নিয়ে এসে দাঁড়ায়, বাবাই আর ভদ্রমহিলা তাতে উঠে যান।

৪১ (৩০ সেকেণ্ডের শট)
পরের দৃশ্যে বাবাইকে প্রায়ন্ধকার বাড়িতে ঢুকতে দেখা যায়। মা বোন শুয়ে পড়লেও জেগে আছে বোঝা যায়।

বোন – কি রে, কি হল। কেমন আছেন নিবারণ জ্যেঠু।
বাবাই – ঠিক আছেন, এখন অনেকটা স্টেবিল। কাল বড়ো ডাক্তার দেখবে।
মা – যাক বাবা... তুই খাবি তো কিছু।
বাবাই – না, না, বললাম না খেয়েছি। তোমরা ঘুমিয়ে পড়।
বাবাই চশমাটা খুলে রাখে টেবিলে। আলো নিভিয়ে দেয়। বিছানায় ঢুকতে গিয়ে হাত লেগে চশমাটা টেবিলের পেছনে পড়ে যায়। অন্ধকার ঘরে টেবিলের পেছনটা একটুখানি আলো হয়ে থাকে।
(সেতারের ঝঙ্কার, মধ্যরাতের সুর। সুরটাকে কেমন যেন করুণ মনে হয়)
ছবিটা ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

৪২ (২ মিনিটের শট)
(বাঁশির করুণ সুর, ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়)
পরেরদিন সকাল, ঝাপসা কুয়াশা ঢাকা বিবর্ণ সকাল। ভালো করে রোদ ওঠেনি, আকাশে হাল্কা কুয়াশা। বাবাই কে দেখা যায় চায়ের দোকানের সামনে কাগজ হাতে। পাশে বাজারের ব্যাগ টা রাখা।
ক্যামেরা পেছন থেকে বাবাইকে দেখায়। চারিদিকে প্রায় রঙহীন বিবর্ণ প্রকৃতি। সামনে একটা প্রায় পাতা ছাড়া গাছের ডালপালা গুলো নুয়ে পড়েছে। গাছের একটা নেড়া ডালে কয়েকটা শিশিরের ফোঁটা জমে রয়েছে। ক্যামেরা তার ওপর ফোকাস করে। টুপটাপ করে কয়েকটা শিশির ঝরে পড়ে, অনেকটা চোখের জলের ফোঁটার মত মনে হয়।
বাবাই ছোট ভাঁড়ে চা নেয়।
চাওয়ালা – বাবাই দা, সত্তরটাকা হয়ে গেল কিন্তু তোমার খাতায়। এবার দিয়ে দিও, কেন আমাদের পথে বসাবে।
বাবাই – সেকি (অবাক হয়ে যায়) কালই তো বললে আমার বাকির সব টাকা নাকি তুষার দিয়ে গেছে।
চাওয়ালা – (সরু চোখে তাকিয়ে থাকে) তোমাদের ওই বন্ধু!! সকাল সকাল পেটে কিছু পড়েছে নাকি, নাকি কাল রাতেরটা নামেনি এখনো। ও দেবে তোমার বাকির টাকা!... সেদিন রাতে যে সবাই মিলে স্পেশাল চা সাঁটালে, সেটার দামটা দিয়েছিল তোমাদের বন্ধু? তোমাদের গুলো সব খাতায় তুলে দিয়েছি, কিন্তু ওরটা কি করব... মাঝখান থেকে আমারই লস। (বাবাই ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়। কিন্তু কথা বাড়ায়না। ধীরে ধীরে বাড়ির পথ ধরে। পেছন থেকে চাওয়ালা ডাকে)... সামনের মাসে দিয়ে দিও কিন্তু।
(বাঁশির সুরটা আবার অস্পষ্ট শোনা যায়)
বাড়ির পথে পা বাড়িয়েই সামনেই দেখা হয়ে যায় সামনের বাড়ির ভদ্রলোকের সঙ্গে। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন ভদ্রলোক। বাবাই নিজের থেকে এগিয়ে গিয়ে কথা বলে।
বাবাই – দাদা ভালো তো।
ভদ্রলোক – ভালো আর বলি কি করে বল তো। যা দিন কাল পড়েছে।... কাগজ দেখেছো, আবার দাম বাড়ছে পেট্রলের।
বাবাই – (বাবাই উসখুস করে) আপনার বন্ধুর সঙ্গে তারপর আর কথা হল।
ভদ্রলোক – কোন বন্ধু বল তো। কি ব্যাপারে...
বাবাই – ওই যে আপনি বলছিলেন এগজিবিশনের ব্যাপারে।
ভদ্রলোক – এগজিবিশান... (ভদ্রলোক আকাশ পাতাল ভাবতে থাকেন) আমি বলেছিলাম... আজকাল কখন যে কাকে কি বলি, মনে থাকে না... (ভদ্রলোক স্বগতোক্তি করেন)
বাবাই – না মানে, কাল সকালে আপনার সঙ্গে যখন দেখা হল...
ভদ্রলোক – কাল! না ব্রাদার, কাল সারাদিন তো আমি বাড়ি থেকে বারই হইনি, প্রেশারটা একটু বেড়েছিল... তবে এগজিবিশনের আইডিয়াটা খুব ভালো, লাগিয়ে দাও একটা, দেশের মানুষ জানুক তোমার কাজ।... এই যেমন পিকাসো, যতদিন...
বাবাই – আমি চলি, হ্যাঁ...
বাবাই হাঁটতে থাকে, বিহ্বল চাহনি, প্রাণপনে কিছু একটা মেলানোর চেষ্টা করে। অস্ফুটে কিছু বলে...
বাবাই – সব গোলমাল লাগছে... চাকরির চিঠিটা, চিঠিটা তাহলে, সুপর্ণা... (বাবাই দ্রুত পায়ে চলতে থাকে, প্রায় দৌড়নোর মত)
(বাঁশির সুরটা ফিরে আসে)

ক্যামেরা পেছন থেকে ওর পা দুটোকে শুধু অনুসরণ করে। পুরো পথটা শীতের ঝরা পাতায় ঢাকা পড়ে থাকে। একসময় পা দুটো একটা বাঁকের আড়ালে হারিয়ে যায়।

৪৩ (২ মিনিটের শট)
বাবাই দরজা খুলে ঢোকে হুড়মুড় করে। দ্রুত পায়ে রান্না ঘরে গিয়ে জিনিসপত্র নামিয়ে রাখে।
মা গজগজ করতে থাকে...
মা – সেই এত দেরি করলি, এতবার করে বললাম... তোদের কারুর যদি কোনো হুঁস থাকে।
(একটা সুর রহস্যময়তা তৈরী করে)
জিনিস নামিয়ে বাবাই প্রায় দৌড়ে গিয়ে ঘরে ঢোকে, একটানে টেবিলের ড্রয়ারটা খুলে ফেলে। ড্রয়ার ফাঁকা। মনে হয় ড্রয়ারের ভেতর দিয়ে একটা প্রায়ন্ধকার সিঁড়ি যেন পাতালে চলে গেছে। বাবাই ধীরে ধীরে ড্রয়ারটা বন্ধ করে দেয়, মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে।
বাবাই – (কাঁপা কাঁপা গলায়) মা... কাল কোন চিঠি এসেছিল?
মা – চিঠি কই না তো, আমি তো নিইনি। বোনকে একবার জিগেস করিস কলেজ থেকে ফিরলে।...তবে আজ বলছিল ফিরতে দেরি হবে, কোথায় যেন যাবে।... বিকেলে আমিও থাকব না। শাড়ি গুলো দিতে যেতে হবে।
(বাঁশির সুরটা আবার ফিরে আসে)
বাবাই দু হাতে মাথা ঢেকে একইভাবে বসে থাকে। সেই পাতাল স্পর্শী সিঁড়ির ছবিটা আবার সামনে ভেসে ওঠে, বাবাইকে অনির্দিষ্ট ভাবে তার মধ্যে নেমে যেতে দেখা যায়। ছবিটা হঠাৎ নড়ে উঠে মিলিয়ে যায়, বাবাই ছটফট করে উঠে পড়ে, জামাটা পাল্টে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায়। পেছন থেকে মা ডাকে...
মা – কিরে আবার কোথায় চললি। খেয়ে যা, কখন ফরবি...
বাবাই জবাব না দিয়েই ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যায়। মা বসে থাকে, চোখ মুখে ভ্রুকুটি।
(বাঁশির সুরটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়)
ছবিটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়।

৪৪ (২:৩০ মিনিটের শট)
ববিকে গাড়ি থেকে নেমে একটা চশমার দোকানে ঢুকতে দেখা যায়। হাতে চশমার বাক্স, কয়েকটা কাগজ। ভেতরে ঢুকে রিশেপসনে কাগজগুলো দেখায়, সমস্যার কথাটা বলে।
ববি – আপনাদের এখান থেকে এই চশমাটা ডেলিভারি নিয়ে গিয়েছিল আমার ড্রাইভার, ডে বিফোর ইয়েসটারডে।
রিশেপসনিস্ট – বিলটা আছে
ববি – হ্যাঁ, এই যে। (হাতে ধরা বিলটা এগিয়ে দেয়)
রিশেপসনিস্ট – (বিলটা দেখে) হ্যাঁ বলুন, কি অসুবিধা।
ববি – মনে হচ্ছে এটার পাওয়ারটা ঠিক হয়নি। একটা অসুবিধা হচ্ছে, ভিশনটা কিরকম একটু ফেড লাগছে।... এই যে পাওয়ার কার্ডটা।
রিশেপসনিস্ট – (আবার বিলটা দেখে) কখন ডেলিভারি নিয়েছে বললেন।
ববি – ডে বিফোর ইয়েসটারডে। গতকালের আগের দিন, এই সন্ধ্যা নাগাদ, এরাউন্ড এইট ও ক্লক।
রিশেপসনিস্ট – একটু ওয়েট করুন প্লিজ, আমি চেক করে দেখছি।
রিশেপসনিস্ট মেয়েটি কাগজ গুলো আর চশমার বাক্সটা নিয়ে ভেতরে চলে যায়। একটু পরেই একজন ভারিক্কি চেহারার লোক হাতে অন্য একটা প্যাকেট নিয়ে বেরিয়ে আসে।
চশমার দোকানের লোক – উই আর এক্সট্রিমলি সরি, ভুল করে অন্য একটা চশমা আপনাকে ডেলিভারী করা হয়েছিল। এইটা আপনার চশমা।
ববি – (চশমাটা হাতে নেয়।) কোনো মানে হয় এভাবে হ্যারাস করানোর...
চশমার দোকানের লোক – আমরা অত্যন্ত দু:খিত স্যার...ভুল করে...
ববি – অন্তত সেটা আপনাদের ফোন করে জানান উচিত ছিল। আমার নাম্বার তো বিলে দেওয়া আছে।
চশমার দোকানের লোক – একটা ভুল হয়ে গেছে...স্যার আমি আমার ম্যানেজারকে বলে আপনাকে একটা ফাইভ পারসেন্ট ডিসকাউন্ট করিয়ে দিচ্ছি। আপনি আমাদের পুরোন কাস্টমার।
ববি – (খুশী হয়) ওকে... ঠিক আছে। (খাপ থেকে খুলে চশমাটা চোখে দেয়। ছবিটা কিছুটা পরিস্কার আর উজ্জ্বল লাগে) হ্যাঁ এটা মনে হচ্ছে ঠিক আছে। (চশমার দোকানের থেকে রিসিট আর রিফান্ড নিয়ে ববি বাইরে বেরোয়। নতুন চশমাটা পরে থাকে। বাইরে দেখা যায় কুয়াশা কেটে গিয়ে চকচকে রোদে উঠেছে। তখনি ববির মোবাইলে একটা ফোন আসে)
ববি – হ্যালো... ইয়েস স্পিকিং... হ্যাঁ অর্ঘদা বল...

- না, না, কাল যেতে হবে তো তাই, সবকিছু একটু অ্যারেঞ্জ করছিলাম।
- কেন, চেন্নাই... কাল যে কথা হল।
- দুর সকাল বেলা ড্রিঙ্ক করব কেন।
- সেকি, কাল আমি অফিসে যাইনি? তোমার আর ডিজি স্যারের সঙ্গে কথা হল!
- ডিজি এখন ইউএস এতে! স্ট্রেঞ্জ...

- না, না কাল রাতে কোন বার ফারে যাইনি।
- আরে না, না ধুর, আমি গাঁজা ফাঁজা খাইনা।
- ও আচ্ছা, অন্য টিম যাচ্ছে।
- ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি সেকেন্ড হাফে আসছি।

ফোনটা রেখে ববি কাঁধ ঝাকায়, অনেক রিল্যাক্স মনে হয়। হাত ওপরে তুলে আড়ামোড়া ভাঙে।
ববি - যা: শালা, কি যে হল। এনি ওয়ে।
ববি গাড়ির দিকে চলে যায়। ব্যস্ত রাস্তায় জনস্রোত, গাড়ির ভিড়ে মিশে যায় ববির গাড়ি।
ছবিটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়।

৪৫ (৪ মিনিটের শট)
(সেতার আর বাঁশির একটা মিলিত সুর শোনা যায়)
বাবাইকে দেখা যায় একটা বহুতল ফ্ল্যাটবাড়ির ভেতর ঢুকতে, তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে। ক্যামেরা পেছন থেকে বাবাইকে অনুসরণ করে। বাবাই একটা ফ্ল্যাটের সামনে এসে দাঁড়ায়। বাইরে অনেক গুলো চটি খোলা, মেয়েদের ফ্যাশানেবল চটি। তার মাঝে একজোড়া নাইকির স্নিকার চোখে পড়ে। বাবাই দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করে, তারপর ডোরবেলে চাপ দেয়। সুরেলা শব্দে ডোরবেল বাজে। দরজা খুলে মুখ বার করেন সুপর্নার মা। বাবাই কে দেখে বেশ অবাক হন।
(সুরটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়)
মা – আরে বাবাই, এসো এসো।... কি খবর তোমার, অনেকদিন দেখা নেই।
বাবাই – (সন্তর্পনে জুতো বাঁচিয়ে ভেতরে ঢোকে।) হ্যাঁ মাসিমা, আমি ভালোই আছি। নানা কাজে আর কি, সময় হয়ে ওঠে না... আজ এদিকে একটা কাজে এসেছিলাম, তাই ভাবলাম...
মা – ভালো করেছো বাবা, ওই সব ওর বন্ধুরা এসেছে... এই ঝুমা (মেয়েকে ডাকে)
বাবাই – আপনি ভালো আছেন মাসিমা?
মা – আর কি, ওই চলে যাচ্ছে। বয়স তো হল... তোমার মা ভালো আছেন, বোন...
বাবাই – হ্যাঁ, মা ভালো আছে। বোন তো পড়ছে, সেকেন্ড ইয়ার।
মা – ভালো... এই ঝুমাদের ও তো এই বছরেই শেষ। এখন আবার কোথায় একটা পাঠিয়েছে, কোন একটা অফিসে যায়। এখন ছ মাস নাকি এরকম চলবে।
বাবাই – বা: খুব ভালো...
মা – কি জানি বাবা, আমি বুঝিনা আজকালকার ব্যাপার। ওর বাবার সঙ্গেই সব আলোচনা করে।... আমি তো বলি এবার বিয়েটা করে নে, সে মেয়ে রাজিই নয়।
বাবাই – না, না। এত ভালো রেজাল্ট করল, চাকরি ঠিকই পেয়ে যাবে। এই লাইনে এখন খুব ডিমান্ড।
মা – কি জানি বাবা, সবাই তো তাই বলছে।... এই ঝুমা, ঝুমা... দেখ কে এসেছে।
আবার মেয়েকে ডাকে। সুপর্না বেরিয়ে আসে, বাবাইকে দেখে খুব অবাক হয়।
সুপর্না – আরে বাবাই দা, তুমি... পথ ভুল করে নাকি।
বাবাই – এদিকে একটা কাজে এসেছিলাম, তাই ভাবলাম একবার ঘুরে যাই। (রান্নাঘর থেকে প্রেসারকুকারের সিটি বাজে, মা ব্যস্ত হয়ে চলে যায়। যেতে যেতে বলে...)
মা – অনেক দিন পরে এলে, আজ দুটো খেয়ে যেও...
বাবাই – (কথাটা ঠিকমত মাথায় পৌঁছায় না, দ্রুত সুপর্নার কাছে সরে আসে, চাপা গলায় কথা বলে) কিছু একটা গণ্ডগোল হচ্ছে বুঝলে, কাল তোমাকে যে কথাটা বলেছিলাম...
সুপর্না – (একটু সরে যায়, স্বাভাবিক গলায় কথা বলে) কাল! কাল আবার তোমার সঙ্গে দেখা হল কোথায়। কাল সারাদিন তো আমাদের অফিসেই কেটেছে, যা চাপ ছিল।
বাবাই – (চাপা স্বরে, একটু মরিয়া ভাবে) কাল তোমার সঙ্গে আমাদের পাড়ায় দেখা হয়নি? আমরা এগরোল আর আইসক্রিম খেলাম...
সুপর্না – বাবাইদা তোমার মাথাটা দেখছি একদম খারাপ হয়ে গেছে। তোমার সঙ্গে কতদিন দেখা হয়নি বলতো। (স্বর নামিয়ে বলে) নাকি তোমার ওই অপগণ্ড বন্ধুগুলোর পাল্লায় পড়ে ড্রাগস ফাগস ধরেছ।... এস ভেতরে এস, তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দিই। বাবাই কিছুটা অনিচ্ছা স্বত্তেও অনুসরণ করে।
বাবাই কে নিয়ে সুপর্না ঘরের ভেতর আসে, তিনটি মেয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে, খাটের ওপর একটি ছেলে, অত্যন্ত স্মার্ট এবং সুদর্শন। দামি ব্র্যান্ডেড জিন্স, টি শার্ট। তার হাতে এখন সুপর্নার গিটার, মাঝে মাঝে সেটার তারে টোকা মারতে থাকে ছেলেটি। সবার চোখ এখন বাবাইএর দিকে।
সুদেষ্ণা – পরিচয় করিয়ে দিই। এই হচ্ছে বাবাই দা... (ছেলেটির কাছে সরে গিয়ে বলে চাপা গলায়) যার কথা তোমাকে বলেছিলাম... আমার এককালের গৃহশিক্ষক, আঁকার স্যার... খুব ট্যালেন্টেড...
আর এই হচ্ছে বিদিশা, সায়নি আর নিধী।... আরে বোসো তো (বাবাইকে বলে, বাবাই সংকুচিত ভাবে বিছানার এককোনে বসে)
বিদিশা- আর দেবপ্রিয় দার পরিচয়টা কে করাবে (গলার স্বরে কৌতুক মিশে থাকে)
দেবপ্রিয় নামের ছেলেটি একদৃষ্টে বাবাইএর দিকে তাকিয়ে থাকে চোখের দৃষ্টিতে কৌতুক আর ব্যঙ্গ মিশে থাকে।

সুপর্না – ঠিক আছে, ঠিক আছে বাবা, বলছি... দেবপ্রিয় দা, আমাদের অফিসের সিনিয়ার, রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার, আরও অনেক গুন আছে, যেগুলো ক্রমশ প্রকাশ্য... আমি আর বলতে পারছিনা। এই তুমি আসার ঠিক আগে আমরা দেবপ্রিয় দাকে ধরেছিলাম গান শোনানোর জন্য।
বিদিশা – অনেক গুনের মধ্যে এটা একটা, দেবপ্রিয় দার অসম্ভব ভালো গানের গলা, আর গিটারের হাত, সব বলা কওয়ার বাইরে।

সুপর্না – (আদুরে গলায় দেবপ্রিয়র কাছে আব্দার করে) নাও না বাবা, কর না একটা গান।
দেবপ্রিয় – আরে দুর, আমি আর কি গান শোনাব। আমি কি আর গান শিখেছি কোনদিন। তার চেয়ে আমাদের নতুন অতিথির কাছ থেকে কিছু শোনা যাক...
বিদিশা – তা আমাদের শোনাবে কেন... দেবপ্রিয়দার গান শুধু তোর জন্যরে, সুপর্না...
(সকলে কলকল করে হেসে ওঠে)
(সেতার আর বাঁশির একটা মিলিত সুরটা আবার শোনা যায়)
ক্যামেরা জুম আউট করতে করতে বাড়ির বাইরে চলে আসে, বাইরে শীতের ঝকঝকে দুপুর। ক্যামেরা বাড়ির বারান্দায় ফোকাস করে, সেখানে টবে দুটো গোলাপ ফুল ফুটে আছে দেখা যায়। তার ওপর একটা পাখির খাঁচা তাতে দুটো পাখি, হাওয়ায় অল্প দোল খাচ্ছে। পেছন থেকে উচ্ছসিত হাসির আওয়াজ হাওয়ায় মিশে যেতে থাকে।

৪৬ (৫ মিনিটের শট)
(সেতারের সুর, গভীর, বিলম্বিত, সন্ধ্যার রাগ)
বাবাইকে ফিরে আসতে দেখা যায় বাড়ির দিকে। শেষ বিকেলের ছায়া দীর্ঘ হয়ে নেমে এসেছে গলির ভেতর। পাড়ার দুটো কুকুর বাবাইএর পেছন পেছন লাফাতে লাফাতে আসে। বাবাই হঠাৎ রেগে যায়। হাত তুলে কিছু বলে, পা দিয়ে একটাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। কুকুর দুটো সরে যায়।
অবসন্ন বিধ্বস্ত চেহারায় বাবাই বন্ধ দরজার তালা খুলে ফাঁকা বাড়িতে ঢোকে। দরজা লাগিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়, দরজার পাশে দাঁড় করান অসমাপ্ত নারীমূর্তি। হঠাৎ একটা অদ্ভুত আক্রোশে বাবাই দুহাতে তার মাথাটা চেপে ধরে, দেখা যায় হাতের শিরা গুলোকে ফুলে উঠতে। একসময় মূর্তির মাথাটা ভেঙে যায়, বাবাই সেটাকে তুলে আছাড় মারে মেঝেতে, টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে মাটির টুকরো গুলো।
বাবাই ধীরে ধীরে ঘরের ভেতর চলে যায়, আবার কোন এক আশায় টেবিলের ড্রয়ারটা টেনে খোলে। ফাঁকা ড্রয়ারে শুধু চশমার খাপটা দেখা যায়। ড্রয়ার খোলা অবস্থাতেই বাবাই বিছানার ওপর বসে পড়ে, দুহাতে মুখ ঢাকে অনেকটা কান্না চাপার মত। তখনই যেন কিছু খেয়াল হয়। মুখ ঢাকা অবস্থাতেই কানের পাসে দুবার হাত বোলায়। স্বগতোক্তি করে... – চশমা!!
বাবাই চকিতে মুখ তুলে তাকায় টেবিলের দিকে। চশমাটা দেখতে পায় না। ড্রয়ার থেকে খাপটা বার করে খোলে, ফাঁকা খাপ। বাবাই পাগলের মত খুঁজতে থাকে এদিক ওদিক। শেষে টেবিলের পেছন থেকে খুঁজে বার করে চশমাটা। তখনি তুলে ধুলো ঝেড়ে চোখে পরতে গিয়ে থমকে যায়। তারপর পাগলের মত ছুঁড়ে ফেলে দেয় চশমাটা, শেষে কান্নায় ভেঙে পড়ে বিছানার ওপর বালিশে মুখ গুঁজে। শব্দ শোনা যায় না, শুধু শরীরটা ফুলে ফুলে ওঠে। চশমাটা বিছানার ওপরেই গিয়ে পড়ে, ভাঙেনা। একটু পরে বাবাই মুখ তোলে, সামনেই দেখতে পায় চশমাটা। প্রায়ন্ধকার ঘরে এখন আবার চশমাটা আপন আলোয় উজ্জ্বল হয়ে থাকে।
(সেতারের সুর বাজতে থাকে কিছুটা দ্রুত লয়ে)
বাবাই যত্ন করে চশমাটা তুলে নেয়। টেবিলের ড্রয়ার থেকে খাপটা বার করে তার মধ্যে ভোরে রাখে, তারপর সেটা হাতে নিয়ে ছাদের ঘরে চলে যায়। টেবিলের তলার দিকের একটা ড্রয়ার খুলে তার মধ্যে একটা কাপড়ে জড়িয়ে রেখে দেয়। ড্রয়ারটাতে চাবি লাগায়, তারপর চাবিটা নিয়ে নীচে নেমে আসে। দরজা খুলে বাইরে বেরোয়, এদিক ওদিক দেখে একটু এগিয়ে যায়, চাবিটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় পাঁচিলের ওপারে একটা জংলা যায়গায়। তারপর পায়ে পায়ে ফিরতে থাকে বাড়ির দিকে, মাথা নিচু করে। ক্যামেরা পেছন থেকে অনুসরণ করে, বাবাই এর গায়ে শেষ বিকালের আলো এসে লাগে। তখনই একটি নারী কন্ঠ বাবাই কে ডাকে।
(সেতারের সুরটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়)
দেখা যায় মেয়েটি একটা রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে কুকুর দুটোকে দিচ্ছে।
মেয়েটি – আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।
বাবাই চমকে মুখ তুলে তাকায়। সামনের বাড়ির মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়। একটু ইতস্তত করে কিছু বলার জন্য। বাবাই কিছু বলতে পারে না, শুধু মুখ তুলে তাকায়, জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।
মেয়েটি – আপনার থেকে আমার একটু সাহায্য দরকার ছিল।

বাবাই – (আরও অবাক হয়) আমার সাহায্য...
মেয়েটি – আমরা এই পাড়ায় নতুন এসেছি, এই বাড়িটাতে ভাড়া থাকি।... আমরা কয়েকজন মিলে একটা নতুন কাজ শুরু করেছি। খুবই ছোটো করে যদিও। এই ব্যাপারটায় আপনাকেও সঙ্গে পেলে খুব ভালো হয়।
বাবাই – আমাকে! কি ব্যাপার...
মেয়েটি – আসলে আমরা ছোটো ছেলেমেয়েদের, যারা আন্ডারপ্রিভিলেজড আর কি, তাদের জন্য কিছু করতে চাই।
বাবাই – এন জি ও র মতো...
মেয়েটি - এন জি ও ঠিক বলা যায় না। ওরা অনেক বেশী অর্গানাইজড হয়। আমরা কয়েকজন একদমই ব্যক্তিগত উদ্যোগে এটা শুরু করেছি। এই বাচ্ছাগুলোকে একটু লেখাপড়া শেখানো, যাতে অন্তত পরে স্কুলে যাবার মত অবস্থায় পৌঁছে দেওয়া যায়। সেই সঙ্গে একটু কালচারাল দিক গুলো, একটু গান, নাচ বা ছবি আঁকা শেখানো। একটু অন্যরকম ভাবে জীবনটাকে দেখতে শেখানো।... রাজারহাটের পেছনে গ্রাম গুলোর ভেতরে অনেক ইঁট ভাটা আছে, জানিনা আপনি কখনো ওদিকে গেছেন কিনা। ওই ইঁট ভাটা গুলোতে যারা কাজ করতে আসে, বেশির ভাগই বাইরে থেকে, তাদের বাচ্ছাদের নিয়ে ওখানে আমরা কাজটা শুরু করেছি।... কি অবস্থায় ওরা থাকে, দিন কাটায়, ভাবা যায় না।... যদি তাদের একটু আলো দেখানো যায়।... আসলে স্বপ্নটা অনেক খানি, সামর্থটা খুবই কম।
বাবাই – খুব ভালো তো...
মেয়েটি – আমরা সবে শুরু করেছি, কিন্ত খুব ভালো সাড়া পাচ্ছি। এক একটা বাচ্ছা, ওই অবস্থার মধ্যও, এত টেলেন্টেড যে ভাবা যায় না।... আপনি যদি আমাদের সঙ্গে আসেন, বাচ্ছা গুলোকে মাঝে একটু আঁকা শেখান তো... একটু রঙ নিয়ে ঘাঁটতে পারলেও ওদের ভালো লাগবে।
বাবাই – ও হো, আচ্ছা... (বাবাইকে একটু ধাতস্ত লাগে, আড়স্ট ভাবটা কেটে যায়)।
মেয়েটি - এই ভাবে হঠাৎ আপনাকে অ্যাপ্রোচ করলাম বলে কিছু মনে করবেন না প্লিজ। আসলে বেশ কয়েকদিন ধরেই ভাবছিলাম আপনার কাছে যাব দেখা করতে, কিন্তু কিছুতেই আর হয়ে উঠছিল না।
বাবাই – না, না, ঠিক আছে আছে... আমি তো বেকার মানুষ, কিছু একটা করতে পারলে তো ভালোই...
মেয়েটি – থ্যাঙ্ক ইউ, আমার মনেই হচ্ছিল আপনি রাজি হবেন।
বাবাই - আপনারা একটা অসাধারণ কাজ করছেন, আজগের দিনে দাঁড়িয়ে...
মেয়েটি – আমাকে আপনি বলবেননা প্লিজ, আমি আপনার থেকে অনেক ছোটো... আমার নাম কমলিকা, আমি রবীন্দ্রভারতীতে পড়ছি, জিওগ্রাফি নিয়ে, ফাইনাল ইয়ার।
বাবাই – (হেসে ফেলে) ঠিক আছে, মনে রাখব। তাহলে আমাকেও আপনি বলো না। আমি তোমার থেকে বড়ো বটে তবে এত বুড়ো নই যে আপনি করে বলতে হবে।
(সেতার আর সন্তুরে একটা মিস্টি সুর বাজতে থাকে)
একটা কুকুর এসে আবার বাবাইএর গা ঘেঁসে দাঁড়ায়। বাবাই সেটার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।
মেয়েটি – (হেসে ফেলে) ঠিক আছে, আজ আপনিই বলছি, পরের বার থেকে শুধু বাবাই দা বলেই ডাকবো।
বাবাই – (একটু চমকে ওঠে) কিন্তু তুমি কি করে জানলে আমি ছবি আঁকি।
মেয়েটি – সে তো এখানে সবাই জানে। (একটুক্ষন মাটির দিকে চেয়ে থাকে। চটির থেকে পা বার করে বুড়ো আঙুল দিয়ে ধুলোতে দাগ কাটতে থাকে। সেই ভাবেই কথা বলে।) তাছাড়া আপনার সব ছবিই এখন আমার জিম্মায়।
বাবাই – (চমকে ওঠে) মানে!!

মেয়েটি – সেদিন আপনি কগজ ওয়ালাকে আপনার সব ছবি গুলো বেচে দিলেন। তারপরেই ও আমাদের বাড়িতে এসেছিল। আমাদের কাছথেকে কাগজ নিয়ে ঝোলাতে ভরার সময় ওগুলো বার করেছে। আমিতো দেখে অবাক... বলে সামনের বাড়ির দাদা ওগুলো বেচে দিয়েছে...। আমি তখনি ওর কাছথেকে ওগুলো নিয়ে নিয়েছি।...
বাবাই – (অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে, চোখমুখ ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে) সেকি... ছবি গুলো সব তোমার কাছে?
মেয়েটি – দেবো না কিন্তু। ওগুলো এখন আমার কাছেই থাকবে।... তোমাকে কোন ভরষা নেই, তোমাকে দিলে আবার কবে রাগ করে কাগজ ওলাকে বিক্রি করে দেবে।... একসময় আমারও খুব ইচ্ছে ছিল,... এখনো মাঝে মাঝে আঁচড় কাটার চেষ্টা করি। স্কেচ গুলো আমার অনেক কাজে লাগছে।
বাবাই – (হেসে ফেলে) ঠিক আছে, ঠিক

আছে। আমি আর কি করব ওগুলো নিয়ে, কারুর কাজে লাগলেই ভালো।... একটা কথা জিগেস করব...
গানের সুর ভেসে আসতে থাকে (প্রাণ ভোরিয়ে, তৃষা হরিয়ে)
মেয়েটি – হ্যাঁ, হ্যাঁ বল না। (দুজনে একটু কাছাকাছি হয়ে দাঁড়ায়)
বাবাই – রোজ সকালে কি তুমি গান কর।
মেয়েটি – হ্যাঁ... কেন, শোনা যায় বুঝি।
বাবাই – ওই গানে শুনে বেশীরভাগ দিন আমার ঘুম ভাঙে।
মেয়েটি – এমা, ছি ছি ছি, বিরক্ত করি...
বাবাই – একটুও না, আমার তো খুব ভালো লাগে... গানের ব্যাপার আমি ঠিক বুঝিনা, কিন্তু আমার মনে হয় তুমি খুব সুন্দর গান কর।
ধীরে ধীরে গানের কথা স্পষ্ট হয়। (প্রাণ ভরিয়ে, তৃষা হরিয়ে, মোরে আরও আরও আরও দাও প্রাণ)। ক্যামেরা জুম আউট করতে থাকে। শেষ বিকেলের মায়াবী আলোয় চরাচর ভেসে যেতে থাকে। বাবাই, কমলিকা যেখানে দাঁড়িয়ে তার পাশে একটা ফুলে ফুলে ভরে যাওয়া শিউলি গাছ। সেখান থেকে অজস্র ফুল ঝরে পড়তে থাকে ওদের ওপর। ক্যামেরা আরও জুম আউট করতে থাকে। আকাশ জুড়ে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে মায়াবী সোনালী আলো। গানের সুর চরাচর ব্যপ্ত করে ছড়িয়ে পড়ে।
ছবি স্থির হয়ে যায়

ডিটেল নেম কাস্টিং চলতে থাকে।